মহাপ্রাচীর

স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য সেতু বন্ধন

৮ম সংখ্যা

বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক :
বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্ব ও উন্নয়ন

47 years OF FRIENDSHIP

বাংলাদেশ-চীন ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক : মো. বশীর উদ্দীন খান

নির্বাহী সম্পাদক : এ বি সিদ্দিক

সম্পাদনা সহকারী : ইফতে খাইরুল হক ইমন
ফারজানা নাজনীন শুচি
মঈন উদ্দিন হেলালী তৌহিদ

তত্ত্বাবধানে : অধ্যাপক ড. মো. সাহাবুল হক
মোহাম্মদ তৌহিদ
ড. এ. এ. এম মুজাহিদ
মারুফ হাসান

সূচিপত্র

১.	Padma Bridge: A Symbol of Friendship, Partnership, and Development	৫
২.	বঙ্গবন্ধু টানেল : উন্নয়নের অংশীদার চীন	১০
৩.	চায়নার জীবন : করোনা এবং প্রেগন্যান্সি	১২
৪.	An international student's trip back to China	১৬
৫.	মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি টেকনোলজি : চীনের ভার্চুয়াল KoL-এর ব্যবহার	২১
৬.	চীনে উচ্চশিক্ষা : কিছু গতানুগতিক ধারণা এবং বাস্তবতা	২৫
৭.	কবিতা : ঝড়	২৭
৮.	গল্প : প্রতিদান	২৮
৯.	সাক্ষাৎকার	৩১
১০.	কবিতা : অদৃশ্য অনুরাগ	৩৪
১১.	মানসিক স্বাস্থ্য ও আপনার ভূমিকা!	৩৫
১২.	দি অ্যাডভেঞ্চার ওফ টু হুইলস	৩৯
১৩.	University Campus: Sichuan University	৪৭
১৪.	সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার	৪৯
১৫.	গল্প : বুড়োর ডায়েরি থেকে	৫১
১৬.	Chinese Paintings of Some Gorgeously Growing Artists	৫৩
১৭.	আলোকচিত্র	৫৫

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন চীনে বসবাসরত বাংলাদেশের সর্বস্তরের (বিসিওয়াইএসএ) শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের একটি প্ল্যাটফরম হিসেবে ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে। সংগঠনটি শুরু থেকেই বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্ক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি অনন্য ও অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। এর কৃতিত্ব কতিপয় স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহানুভব মানুষের যারা এই সংগঠনটি গড়ে তোলার মত ইতিবাচক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সংগঠনটির পথপরিক্রমায় ২০১৯ সালে এর সাথে যুক্ত হয় অনলাইন ম্যাগাজিন, "মহাপ্রাচীর" এবং অনলাইন ভিত্তিক সংবাদ পোর্টাল, 'বিসিওয়াইএসএ নিউজ'। বিদগ্ধ পাঠকসমাজ এই উদ্যোগগুলোকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে আমাদের ঋদ্ধ করেছেন।

হাটি হাটি পা পা করে আমাদের মহান বিজয় দিবসের অব্যবহিত পরে আমরা আমাদের ম্যাগাজিনের ৮ম সংখ্যা প্রকাশের দ্বারপ্রান্তে আজ। ম্যাগাজিনের প্রতিটি সংখ্যায় লেখা সংগ্রহ, বাছাই ,ডিজাইন নির্বাচন ,সম্পাদনা , মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধনসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ম্যাগাজিনের সাথে সম্পৃক্ত এক ঝাঁক মেধাবী তরুণ এই সুকঠিন কাজগুলো করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে ম্যাগাজিনকে প্রতিনিয়ত এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন। আমাদের সম্মানিত পাঠক ও সুধীমহল থেকে পাওয়া গ্রহণযোগ্যতা এবং উৎসাহ প্রতিনয়ত আমাদের কাজে প্রেরণা যোগায়।

ম্যাগাজিনের গতানুগতিক ধারায় আমরা অন্যান্য সংখ্যার মতো অনেক গুণী লেখক এবং সম্ভাবনাময় নবীন লেখকদের লেখা পেয়েছি। সম্পাদকীয় নীতিমালা অনুসরণ করে আমরা লেখাগুলো প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আমাদের সংগঠন একটি অসাম্প্রদায়িক ও অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। আমাদের সম্পাদকীয় নীতিতেও ব্যাপারটির প্রতিফলন নিশ্চিত করে থাকি আমরা। আমি আশা করি আগ্রহী পাঠকগণ লেখাগুলো পড়ে উপকৃত হবেন এবং বাংলাদেশ ও চীনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বহুমাত্রিকতা উপলব্ধি করার সুযোগ পাবেন।

ম্যাগাজিন প্রকাশের মত এই সুকঠিন কাজটি সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিসিওয়াইএসএর সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী, পরিচালনা পর্ষদ, সম্পাদনা পর্ষদ এবং লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবার জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা কামনা করি।

বিনীত
মোঃ বশীর উদ্দীন খান
সম্পাদক

০৯ জানুয়ারি, ২০২৩
সাংহাই, চীন।

Padma Bridge: A Symbol of Friendship, Partnership, and Development

There are two sides to the river Padma: in the winter it is peaceful and serene, and in the summer it is harsh and ferocious. Padma may be found flourishing in the words of poets, in the voices of musicians, and above anything else in our hearts. On June 26, 2022, Padma Bridge was officially opened by the government.

This resulted in another another triumphant period for Bangladesh. Construction of the Padma Bridge's river training works at Jajira point, Shariatpur, and at Mawa, Munshiganj, as well as the main bridge's number 7 piling construction at Mawa circle, were all opened that day. This marked the formal beginning of work on the major bridge.

The seventh pillar, located one kilometer inside the river bed at Mawa, will be started immediately after the PM's ceremonial inauguration. German-made 10,000-ton hydraulic hammers were used to push pillars into the river bottom. Only one pillar will emerge from the river bed per six pilings. The 42 pillars will support Padma Bridge, which will span the river between its two sides.

History

The Padma Bridge is an essential part of the puzzle for a more balanced growth of the southern part of Bangladesh. The government of Bangladesh reached a deal with the World Bank and a few other organizations in April 2011 to secure the financing. Initially, the World Bank agreed to fund the project with $1.2 billion. Yet, the World Bank's lending arrangement was terminated in June of 2012. Only temporarily was the dream of Padma Bridge shattered. In a bold move, the government of Bangladesh immediately decided to build the Padma Bridge using its own resources. Construction of Padma Bridge has reached a critical juncture and is about to be completed. By December 2014, the first work orders had been issued. The river training works for the Padma Bridge were officially opened to the public on December 12, 2015, at Jajira point in Shariatpur. She also dedicated Mawa's new main bridge on the same day.

Building Plans for the Padma Multipurpose Bridge

Padma Bridge, as planned, would stretch for around 6.15 kilometers. Once finished, it will be Bangladesh's longest road bridge. The construction sites for the bridge are located at Mawa, Munshiganj, and Janzira, Shariatpur. Louhajong in Munshiganj will be linked to Shariatpur and Madaripur district, bridging the north and east to the south and west of the nation. There will be 42 of these pillars supporting the bridge. Forty will be in the

river itself, while the other two will be on the approach roads leading up to the connecting bridge. Each pillar will have six piles placed in the river below it, for a total of two hundred and forty piles. A total of 24 more piles are needed to support the exterior's two pillars. Exactly 264 heaps will be present. Each pile will be 150 meters long, with 120 of that length going into the ocean at great depth (the deepest of any bridge in the world). The pillars will support steel bridges. There will be 41 individual spans on the bridge. The bridge will consist of two stories. Up above, you'll find a four-lane highway, and down below, a train line. The train will travel at a speed of 160 kilometers per hour. The bridge will last for a century.

Progression

The term Padma Bridge conjures up images of utopia. Through the construction of the Bridge, direct road connections will be made between Dhaka and 21 of the country's southern districts. More than 1% will be added to the annual growth rate of the GDP. The Padma Bridge has been a desire of the million people living in the southwest area for a very long time. Just as Bangladesh's government was becoming serious about beginning building on the dream

bridge, the international organization withdrew its support. As a result of the allegations of corruption that surfaced in June 2012, the World Bank and other donor agencies ceased all credit transfer activities. Immediately after that, there was a barrage of criticism. Many people believed that the dream of building the Padma Bridge had passed away. However, the decision made by the government of Bangladesh was so firm that it is pushing through with the construction of the Padma Bridge using its own funds. After that, in the year 2014, the work order for the building of the Padma Bridge was issued in August, and construction began in December of the same year. It was the bravest choice ever made in Bangladesh's long and illustrious history.

The steps involved in the construction process are as follows:

1. Construction tasks are broken up into bundles:

The project has been roughly broken down into six sections to facilitate quick and easy development. There are a total of six tasks, five of which are physical and one managerial. These are the constituent physical elements:

a. Main bridge: An agreement with China Major Bridge Engineering Co. Ltd, China was signed in June 2014 for main construction work of Padma Bridge. The agreement was signed for a period of 4 years+1 year (defect liability period). They were ordered to begin construction in November of same year. The allotted amount for the main Bridge was BDT 12,133.39 crore. They started working from the next month. Up until January 2016, 17.27% of the work has been completed. Construction of main Bridge is supervised by Korean Express. The completion is expected within four years from the starting date.

b. River Training: An agreement between China's Sinohydro Corporation and Bangladesh Bridge Authority was signed for the river training works. The agreement was signed for a period of 4 years+1 year (defect liability period). The allotted contract cost is BDT 8, 707 crore. Starting from December 2014 the construction is now moving ahead that will be completed in 2018. Now the estimated work progress is 14 percent. Construction of river training work is supervised by Korean Express. 20,300 concrete blocks are being made every day for river training.

c. Jajira Link Road: Bangladesh's Abdul Monem Ltd and Malaysia's HCM Construction Ltd started the project of Jajira link road in October 2014. The agreement was signed for a period of 3 years+1 year (defect liability period). 10.5 kilometer long Jajira link road with Padma Bridge is approximately 59 percent completed. The allotted cost in this part is approximately BDT 1, 097 crore.

d. Mawa Link road: Bangladesh's Abdul Monem Ltd and Malaysia's HCM Construction Ltd jointly started the project of Mawa link road in January 2014. The construction of two kilometer long Mawa link road is also approximately 63 percent completed. The construction is supposed to completed in 2.5 years from the beginning that would be in July 2014. Bangladesh military is supervising the whole construction work. The allotted cost in this part is approximately BDT 193.40 crore.

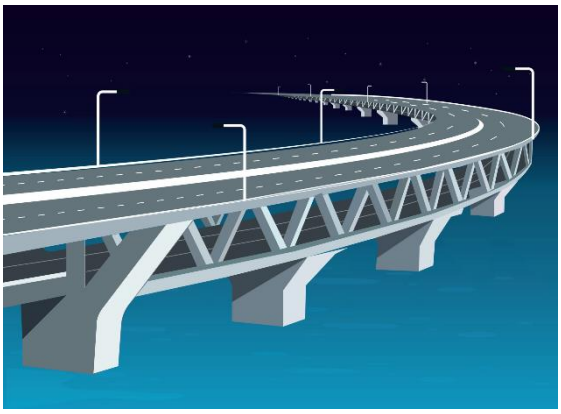

e. Other Infrastructures: Other infrastructures include service area-2, resettlement, land acquisition, engineering support etc. Progress of each of the individual construction is satisfactory. 1, 408.54 hectre land has been acquired from three districts of Munshiganj, Madaripur and Shariyatpur. 1, 270 out of 2, 592 plots have been handed over to the affected families. Tree plantation has beenstarted and 55150 nos. of tree plantation has been completed up to-date.

f. Supervision Work: Supervision of whole project is given to two companies named Korean Express and Bangladesh Army.

2. Technical aspects and Funding:

Some seasoned international organizations are relied upon to handle the technical requirements. Piling under the river bed is the most challenging

aspect of any building project. The piles themselves were manufactured in China, and many hydraulic hammers were sent in from Germany in order to force them into the ground. Just 7 of the 42 required pillars have been installed at this point. For every six pilings, one pillar will be born. Each support will be spaced at a distance of 150 meters. Forty stories' worth of water will cover 120 meters of the piles. There will be 150m of piling in total. The clay in the Padma River's bed reduces its ability to absorb force. That's why it's necessary to pile up so high.

The Padma Bridge's development relies on on financial backing. The budget for this project is put at BDT 29000 crore. The remaining ninety-five percent will come from inside the country. The government will provide BDT 27,428 crore, while international aid will contribute BDT 1,365 crore. The Indian government is the primary donor of international aid. Since Bangladesh lacked the necessary funds, an agreement was reached with the World Bank and other donor institutions. When the donor group, headed by the World Bank, abruptly pulled out of the deal, a crisis ensued almost immediately.

Padma Bridge was just a pipe dream until the government of Bangladesh made the bold decision to build it using its own resources.

Construction of Padma Bridge will need a substantial outlay of foreign funds. Bangladesh Bank's Foreign Exchange Reserves Have Grown to Over $28 Billion. More than $15 billion is sent back home annually in the form of remittances. The Bangladesh Bank can provide enough foreign currency to meet demand for the next four years without negatively impacting the economy. In other words, with this promise from ex-Bangladesh bank governor Atiur Rahman, the greatest infrastructure project in the country's history may finally get off the ground. Agrani Bank was tasked with alerting Bangladesh Bank of the funding needs in a timely manner.

The economic Importance:

When completed the Padma Bridge will connect 21 southwest districts with the capital Dhaka and eastern region. Other benefits are as follows -

Total Economic Growth: Advances in communication infrastructure are crucial to a country's economic progress. If the Padma Bridge is built, it will improve connection between the southwest areas and the rest of the nation. The economy as a whole will benefit from this. Padma Bridge, according to a World Bank study, will increase GDP by $6 billion over the next 31 years, beginning in 2015. By 2032, it will have generated $300 million in yearly economic benefits.

Secondly, the Bridge will enhance international communication, which will in turn enhance regional cooperation. The potential for neighboring states to work together more closely will be expanded. With the Padma Bridge, Bangladesh will be linked to the future Trans-Asian Highway and International Communication Network.

Third, the progress of industry relies on road communication, which is sometimes called the "blood" of economic growth. Having access to raw materials and a market for completed goods depends on a well-developed network of roads and communications. Padma Bridge will, without a doubt, promote greater industrial growth.

Progress in Agriculture and Rural Life: Progress in Agriculture and Rural Life is Progress in the Country Padma Bridge's improved communication links will have a significant impact on agriculture and its practitioners. By encouraging more agricultural and, in particular, vegetable production, it will

help increase employment in the southwest area by 10.2 percent.

The Padma Bridge will improve internal communications throughout the nation, which brings us to our fifth point: external development. Internal growth will boost capital movement. Good news for the country's economy. Dhaka will provide the inhabitants of the area with improved access to the most cutting-edge medical technology and healthcare options. Better education and training facilities, as well as further skill development, will be readily available thanks to streamlined communication.

Padma Bridge will aid in the development of industry, commerce, and the transportation system, all of which will result in an increase in available jobs. Potential job openings may increase as a result. Approximately two crore jobless Bangladeshis will find jobs as a consequence.

Donor groups estimate that the bridge will have a yearly impact on poverty reduction of 1.9%. The trajectory of impoverished people's lives will shift as a consequence.

It is not uncommon for river banks to erode over time. More than 9,000 acres of land will be

safeguarded from riverbank erosion and floods thanks to the river training work for Padma Bridge. At least USD 156,000,000 will be saved due to the land being preserved.

Reduced Government Spending: Subsidies for ferry service might be reduced by half if the planned bridge were built. Additional savings of almost USD 400 million will result from the shutdown and/or reduced operating of ferries.

South and West Region Development The Southwestern part of the nation is still in its early stages of development. An already serious issue is made much worse by the lack of reliable transportation and communication. Numerous groups believe Padma Bridge will make a decisive contribution to the eventual development of this relatively impoverished area, home to more than 30 million people.

A B Siddik
Masters, College of Civil Engineering,
Nanjing Forestry University, Nanjing, China.

বঙ্গবন্ধু টানেল : উন্নয়নের অংশীদার চীন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্ডারওয়াটার রিভার ক্রসিং, প্রায় সম্পূর্ণ এবং 2023 সালের মার্চ মাসে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

এই সুড়ঙ্গটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে বিশেষত, চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলাকে শহরাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করবে। যুক্ত করবে। এই সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। মীরসরাই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন রোড প্রকল্পকে বিবেচনায় নিয়ে নির্মিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু টানেল। দেশের পর্যটনের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান কক্সবাজারের দূরত্ব কমিয়ে দেবে বঙ্গবন্ধু টানেল। একদা স্বপ্ন থাকলেও তা এখন বাস্তবে রূপ পেতে যাচ্ছে।

সুড়ঙ্গটির মূল দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার হলেও এর সঙ্গে ৫ কিলোমিটারের বেশি সংযোগ সড়ক যুক্ত হবে। এ টানেলে সংযুক্ত হবে চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড। চট্টগ্রাম শহরপ্রান্তের নেভাল একাডেমির পাশ দিয়ে শুরু হওয়া এ টানেল নদীর দক্ষিণ পাড়ের সিইউএফএল (চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড) এবং কাফকো (কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার লিমিটেড) কারখানার মাঝামাঝি স্থান দিয়ে। কর্ণফুলীর মধ্যভাগে বঙ্গবন্ধু টানেল যাবে ১৫০ ফুট গভীরে। দুটি টিউবের একটি দিয়ে যানবাহন যাবে এবং আরেকটি দিয়ে ফিরবে। প্রতিটি টিউব হবে দুই লেনের, অর্থাৎ দুই টিউব মিলে চার লেনের সুড়ঙ্গপথ তৈরি হচ্ছে।

প্রকল্প পরিচালক জানান, বঙ্গবন্ধু টানেলের জন্য থাকবে সার্বক্ষণিক বিদ্যুত ব্যবস্থা। সে কারণে তৈরি করা হচ্ছে ৩৩ কেভির দুটি নিজস্ব সাবস্টেশন ও সঞ্চালন লাইন। জরুরী প্রয়োজনে যেন এক টিউব থেকে অন্য টিউবে যাওয়া যায় সে জন্য তিনটি স্থানে থাকবে সংযোগ ব্যবস্থা।

২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। সুড়ঙ্গ নির্মাণে ব্যয় হবে ৯ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং এর ঢাকা সফরে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুযায়ী চীনের এক্সিম ব্যাংক ২০ বছর মেয়াদি ঋণ হিসাবে ৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা দিচ্ছে। বাকি অর্থায়ন বাংলাদেশ সরকার করছে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) কর্ণফুলী টানেলের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (ওঅ্যান্ডএম) জন্য চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সিসিসিসি)'র সাথে, যারা এখন টানেল তৈরির কাজেও নিয়োজিত রয়েছে, একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে একটি বিধান সংশোধন করে যার মাধ্যমে পাঁচ বছর মেয়াদী চুক্তির 35 শতাংশ মূল্য যা টাকার অংকে প্রায় 9.84 বিলিয়ন টাকা, বিদেশী মুদ্রায় সিসিসিসি'কে প্রদান করা হবে।

কর্ণফুলীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু টানেল ঘিরে সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নে চট্টগ্রাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করেছে বলে মনে করছেন চট্টগ্রামবাসী। তারা বলছেন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অগ্রগতিসহ প্রতিটি খাতে এই টানেল যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও, টানেল নির্মিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি যেমন সাধিত হবে, তেমনি বাড়বে সৌন্দর্য। কর্ণফুলী টানেল চট্টগ্রামকে পরিণত করবে চীনের সাংহাইয়ের আদলে ওয়ান সিটি টু টাউনে। দু'পাড়ের এ সেতুবন্ধনে দক্ষিণ চট্টগ্রামে গড়ে উঠবে নতুন শিল্প কারখানা ও শিল্পাঞ্চল যা একই সাথে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি ও দেশের জিডিপির হার ০.১৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি করবে বলে আশা করছেন অর্থনীতিবিদরা।

মো. সাকিব উল্লাহ সৌরভ
মাস্টার্স শিক্ষার্থী (থিসিস চলমান), ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শেনডং ইউনিভার্সিটি অফ ফিন্যান্স এন্ড ইকোনোমিক্স

চায়নার জীবন : করোনা এবং প্রেগন্যান্সি

প্রথম মা হওয়ার অভিজ্ঞতা বরাবরই সুন্দর। আর তা যদি হয় দূর পরবাসে তবে তা ভয়ংকর... না না ভয়ংকরতম সুন্দর। গল্পটা অজানা অভিজ্ঞতা, অচেনা ভাইরাস আর বদ্ধ শহরে আমাদের লাল নীল সংসারকে নিয়ে।

প্রথম যখন চায়নাতে পা দেই, বুঝতেই পারিনি এতটা সময় এখানেই কাটাতে হবে। ফাস্ট ইয়ারে পড়াশোনার প্রচন্ড চাপে তেমন একটা ঘুরতে যাওয়া হয়নি। আর যখন সবকিছু গুছিয়ে আনলাম ঘুরবো বলে তখন ই শুরু হলো করোনা। লকডাউনে ভার্সিটিতে আমাদের বদ্ধ জীবন। হাজারো স্টুডেন্টের পদচারণায় মুখরিত ক্যাম্পাসটাকে তখন জনঃশূন্য শ্বশান মনে হতো। মনে পড়ে প্রায়ই মানুষ দেখার জন্য আমি আর ও ইউনিভার্সিটির মেইন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। অবরুদ্ধ স্টুডেন্টদের প্রয়োজন অনুযায়ী তখন নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের সাপ্তাহিক বাজারের আয়োজন করতো ভার্সিটি। রান্নার সীমিত উপকরণ সেখান থেকেই নিতে হতো। মাঝে মাঝে হালাল চিকেন পাওয়া যেতো তবে মাছ ছিলো না কখনোই।

ছবি-করোনাকালানী জনঃশূন্য ক্যাম্পাস-২০২০

৯ মাসের প্রেগনেন্সি জার্নির প্রথম ৫ মাস আমার এই ক্যাম্পাসেই কাটে। হাজারো নিয়মের মাঝে তখন ডাক্তার দেখানোটাই ছিলো আমাদের প্রথম সংগ্রাম। নিরুপায় হয়ে ইন্টারন্যাশনাল অফিসে যোগাযোগ করলাম। আমার অপছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা ব্যক্তি তখন দ্বায়িত্বরত। হাসবেন্ডের মুখে আমার অসুস্থতার কথা শুনেই উনি হেসে দিলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "Oh...man, congratulations!!! Your wife is pregnant! My wife had also similar symptoms!" অত্যন্ত অপ্রস্তুত আমরাও হেসে দিলাম। স্যার নিজেই ইউনিভার্সিটির হসপিটালে ফোন দিলেন। ওনার এই আন্তরিকতা শেষদিন পর্যন্ত একই ছিলো। ইউনিভার্সিটির হসপিটালগুলোতে সাধারণত প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট এর বাহিরে অন্য কোনো সেবা দেয়া হয় না। তাই আমাকে বাহিরে অন্য কোনো হসপিটালে দ্রুত দেখাতে বললো। বাহিরে বের হলেই তখন ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন। টিচার, স্টুডেন্ট, স্টাফ সকলের জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। এমনিতেই ইউনিভার্সিটির প্রাচীরটা আমার কাছে জেলখানার সীমানা মনে হতো তার মাঝে একরুমে আটক জীবন... উহ, ভাবতেই পানি ছাড়া মাছের মতো লাগছিলো।

ছবি-ক্যাম্পাসে আরোহীহীন এলোমেলো বাইসাইকেল-২০২০

কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না আমরা। ততোদিনে ৩ মাস শেষ হতে চলেছে। মানসিক অস্থিরতা, থিসিসের প্রেশার, প্রফেসরের চাপ আর ফুড অ্যাভারশনস..... সব মিলিয়ে আমি দিশেহারা। যেহেতু কোয়ারেন্টাইন মাস্ট, তাই সিদ্ধান্ত নিলাম একাই যাওয়ার। ও বাহিরে থাকলে অন্তত ঘরের রান্না করা খাবার জুটবে। চাইনিজে তখনও আমি অভ্যস্ত নই।

স্যারকে জানালাম। তিনি ততোদিনে আমাদের কাছের মানুষদের একজন। একটা কাগজে সাইন দিয়ে বললেন, মনস্থির করতে পারলে ডেট বসিয়ে নিয়ো। আমি কিছুদিন নাও থাকতে পারি। তখন হসপিটালে যাওয়ার জন্য অগ্রিম সিরিয়াল নিতে হতো। ভার্সিটির এক ভাই ছিলেন যিনি চাইনিজ বিয়ে করেছেন। সিরিয়ালের জন্য ওই চাইনিজ ভাবির হেল্প নিলাম। আমার হাসবেন্ডর রিকোয়েস্টে ভাই হসপিটালে আমার সাথে যেতে চাইলেন। যাওয়ার দিন সকালে ও ইন্টারন্যাশনাল অফিসে গেলো হসপিটালের অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর কপি জমা দিতে। সৌভাগ্যক্রমে স্যারের সাথে দেখা। দেখেই বললেন, "What's wrong man!! Why don't you go with your wife? It's a crucial time. You should go with her." ও স্যারকে জানালো আমার এই অবস্থায় বাহিরের খাবার খাওয়া সম্ভব না। ভীষণ অবাক করে দিয়ে স্যার বললেন নিশ্চিন্তে যাও। তোমাদের যাতে কোয়ারেন্টাইনে থাকা না লাগে সেই ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি!!

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে বের হলাম। গেটে যেতেই দেখি ভাই ভাবিসহ গাড়ি নিয়ে ওয়েট করছেন। খুব অবাক হলাম যখন জানতে পারলাম ভাবি আমার জন্য অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন। কাজ পাগল চাইনিজদের এই আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করলো। যেতে যেতেই জানতে পারলাম চায়নাতে ডেলিভারির ক্ষেত্রে আগে থেকে হসপিটাল ঠিক করতে হয়। সেখানে নিজের নামে ফাইল ওপেন করে পরবর্তীতে সমস্ত চেকআপ করতে হয়।আর দেরি হয়ে গেলে হসপিটাল খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। টেনশনের লিস্টে নতুন আরেকটা যোগ হলো "হসপিটাল খোঁজা"।

ঐদিন আমাদের গন্তব্য ছিলো পিকিং ইন্টারন্যাশনাল হসপিটাল। করোনার কারণে হসপিটালে ঢোকার ক্ষেত্রে বেশ ভাল রকমের ঝামেলা পোহাতে হলো।ডাক্তার দেখালাম, রিপোর্ট আলহামদুলিল্লাহ ভালো আসলো। হসপিটাল থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো এখানে ফাইল ওপেন করা হবে কিনা। টোটাল কস্ট জানতে চাইলাম। রিসেপশনিস্ট বলল ডেলিভারি পর্যন্ত ৬০-৮০ হাজার ইউয়ান লাগবে যা বাংলাদেশী টাকায় তখনকার সময়ে প্রায় ৮.৫-১১.৫ লক্ষ টাকা। খরচের কথা শুনে আমাদের তো মাথায় হাত!! ভাবি নিজেও অবাক হলো। বললো চাইনিজদের তো মাত্র ৫-১০ হাজার ইউয়ান লাগে। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ বলল ফরেইনারদের ক্ষেত্রে খরচ আলাদা। রিপোর্ট ভালো আসা সত্ত্বেও বাসায় আসলাম পাহাড়সম টেনশন নিয়ে। ডেলিভারির জন্য আমাদের দেশে আসার ইচ্ছে আগে থেকেই ছিল কিন্তু টেনশন করছিলাম মাঝখানে যদি কোন প্রবলেম হয় তবে ডাক্তার দেখাবো কি করে।

২০২০ এর জুনে আমাদের ডিফেন্স শেষ হলো। দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যেহেতু ফ্লাইট অ্যাভেইলেবল ছিলনা তাই টিকিটের মূল্যও ছিল প্রচুর। বেশ কিছুদিন খোঁজাখুঁজির পর কিছুটা কম মূল্যে টিকিট পেয়ে গেলাম।টাকা পরিশোধ করার আগে স্যারকে জানালাম।যেহেতু আমার পিএইচডি তে এপ্লাই করা ছিলো তাই উনি যেতে মানা করলো। বললো দেশে গেলে সহজে আর আসতে পারবে না। কষ্ট করে এখানেই থাকো। ভার্সিটির বাহিরে বাসা নাও তাহলে তোমার জন্য হসপিটালে যাওয়া-আসা সহজ হবে।

বাসায় সবাই অপেক্ষা করছিল আমাদের দেশে আসার। যাব না শুনে আব্বু, আম্মু আশাহত হলো।কিছুই করার ছিল না। আমি নিজেও বেশ কষ্ট পাচ্ছিলাম।জীবনের এত কঠিন মুহূর্তে বাবা-মা কাছে থাকবে না ভেবে ভেঙে পড়লাম।

নিজেরা এবং পরিচিত কয়েকজনকে দিয়ে হসপিটাল সার্চ করছিলাম।এমনিতেই করোনা তার ওপর ফরেইনার শুনে কোন হসপিটালই নিতে চাচ্ছিল না। হসপিটাল ঠিক করার ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বড় যেই বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার। আমরা দুইজনের একজনও চাইনিজ জানতাম না। যাদেরকে দিয়ে হসপিটালে ফোন করাতাম তারা কতটুকু বলতো, কী বলতো, কীভাবে বুঝাতো তাতো আর বুঝার উপায় ছিলো না। সিদ্ধান্ত নিলাম ইউনিভার্সিটি আর নয়। এভাবে ফোন করে হসপিটাল ম্যানেজ করা সম্ভব না। নিজেরাই প্রতিটা হসপিটালে গিয়ে খোঁজ নেব। কিছু হসপিটালের লিস্ট করলাম যেখানে পূর্বে কয়েকজন ট্রিটমেন্ট নিয়েছিল।

শুরু করলাম হন্যে হয়ে বাসা খোঁজা। আবার সেই একই প্রবলেম। করোনার কারণে কেউ ফরেইনারদের বাসা ভাড়া দিচ্ছে না! জীবনটা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো। কী যে দূর্বিষহ লাগত সময়টা তখন। মাঝে মাঝে মনে হতো সব ছেড়েছুড়ে দেশে চলে যাই। এত প্রেশার আর নিতে পারছিলাম না। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে একটা বাসা পেলাম।গিয়ে দেখার কোনো উপায় ছিল না। আমরা আর দেরি করলাম না। ডরমিটরি ছেড়ে যাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন দিলাম ইউনিভার্সিটিতে। আমাদের সব প্যাকিং করা শেষ। যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়িওয়ালা জানালো সে বাসা ভাড়া দেবে না। প্রায় ৫ ঘন্টা ধরে আমরা তাকে কনভেন্স করার চেষ্টা করলাম। অবশেষে অনেকগুলো শর্তের বিনিময়ে সে আমাদের বাসা ভাড়া দিতে রাজি হলো।

জুলাইতে আমরা নতুন বাসায় উঠলাম। বাসা খুব পছন্দ হলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই বাড়িওয়ালাও আমাদের সাথে খুব আন্তরিক হয়ে গেলো। বেবি হওয়ার আগে এবং পরে সবসময়ই সে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার খেয়াল রেখেছে। নতুন প্লেসে এসে আমাদের প্রথম কাজ ছিল হসপিটাল খুঁজে বের করা। বাসার আশেপাশে এত হসপিটাল কিন্তু কোথাও ফরেইনার নিচ্ছিলো না। লিস্ট ধরে ধরে বেশ কয়েকটি হসপিটালে গেলাম কিন্তু কাজ হলো না। যেসব হসপিটালগুলোতে আগে ফরেইনার নিচ্ছিল সেসব হসপিটালগুলোও তখন আর ফরেইনার নিচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনই আশা নিয়ে বের হতাম আর ফিরে আসতাম ব্যর্থ হয়ে। আজ কতো সহজেই না লিখছি কিন্তু দিনগুলো কি আসলেই এতো সহজ ছিল!

অবশেষে আল্লাহ আমাদের সহায় হলেন। কথা প্রসঙ্গে আমার হাসবেন্ড এক ইয়েমেনীর খোঁজ পেলো যিনি ৮ মাসের মাথায় ওনার ওয়াইফের জন্য হসপিটাল পেয়েছিলেন। খবরটা যে আমাদের জন্য কতটা স্বস্তির ছিলো তা আজ বুঝানো সম্ভব নয়। আমার ক্লাসমেটের এক ফ্রেন্ডকে নিয়ে ওই হসপিটালে গেলাম। ইয়ানী ইউরোপীয়ান, প্রায় ১৫ বছর ধরে চায়নায় থাকার সুবাধে ভাষাটা ওর নখদর্পনে। তাই ও সাথে থাকাতে হসপিটালে সব বুঝিয়ে বলতে বেগ পেতে হয়নি। ওরা ফাইল ওপেন করতে রাজি হলো। কিছু ডকুমেন্টস সাথে নিয়ে পরের সপ্তাহে আসতে বললো। পুরো একটা সপ্তাহ আল্লাহকে ডেকে কাটিয়েছি। ভয়ে ছিলাম কখন না যেনো আবার মানা করে দেয়। ফাইল ওপেন করার দিন লুসি নামের এক চাইনিজ মেয়ে ছিল আমাদের সাথে। ও ইয়ানীর ফ্রেন্ড, বাংলাদেশে জব করার সুবাদে লুসি বাঙ্গালীদের প্রতি আন্তরিক ছিল। তাই স্বেচ্ছায় আমাদের হেল্প করতে এসেছিল। আল্লাহর

অশেষ রহমতে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই আমরা ফাইল ওপেন করতে পেরেছিলাম।

মজার ব্যাপার হলো ইয়ানী বা লুসি কেউই জবের ব্যস্ততার কারণে একবারের বেশি আমাদের সাথে যেতে পারেনি। আর ওদিকে হসপিটালে নার্সরা আমাদের সাথে কথা বলতে না পারায় ওদের আসায় পথ চেয়ে থাকতো। গেলেই বলতো তোমাদের ইন্টারপ্রেটার কই? প্রথম প্রথম ওরা কথা বলতে ইতস্তত বোধ করলেও পরবর্তীতে মোবাইলের কল্যানে তা সহজ হয়ে যায়। একবাক্যও চাইনিজে বলতে না পারা আমি পুরো জার্নিটা শেষ করেছি ট্রান্সলেটর অ্যাপ ব্যবহার করে। এই যে অ্যাপ ব্যবহার করা, অর্থ ঠিক মতো না আসলে কয়েকবার করে একই কথা বলা, সময় নষ্ট হওয়া এসবের জন্য কখনোই একবিন্দুও বিরক্ত হতে দেখিনি ডাক্তারদের। উল্টো ইংরেজি বলতে না পারার জন্য কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করতো ওরা। কী অদ্ভুত তাই না!

৬ মাসের সময় আমি হসপিটাল পেয়েছিলেন। হসপিটাল পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের জার্নিটা যতটা কঠিন ছিল, পরবর্তী সময়টা ছিল ঠিক ততটাই সহজ। আগস্ট থেকে নভেম্বর, এই কয়েক মাসে আমরা যে কতবার হসপিটালে গিয়েছি তার হিসেব নেই। বাসা থেকে হসপিটালের দূরত্ব ছিলো ৪০ কিঃ মিঃ। ২ ঘন্টা-২ ঘন্টা, ৪ ঘন্টার এই যাওয়া আসার জার্নিটা ক্লান্তিকর হলেও ডাক্তারদের আন্তরিকতার ছোঁয়ায় তা ম্লান হয়ে যেত। কখনো সময়মত পৌঁছাতে না পারলে বার বার ফোন দিয়ে খোঁজ নিয়েছে ওরা।

২৪শে নভেম্বর, আমাদের রাজকন্যার আগমনের দিন। আল্লাহর অশেষ রহমত, চেনা-অচেনা কিছু মানুষের ভালোবাসা, ডাক্তারদের যত্নশীল আচরণ সব মিলিয়ে অবশেষে খুব ভালো ভাবেই আমরা করোনাকালীন এই কঠিন সময়টাতে অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। ওর আগমন আমাদের এই ক্লান্তিকর পথচলার সমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন আরেক পথের দ্বার খুলেছে।

উম্মে হাবিবা সাদিয়া
পি এস ডি শিক্ষার্থী,
নর্থ চায়না ইলেক্ট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি, বেইজিং, চায়না

An international student's trip back to China

I am a doctoral candidate in the aerospace field at Beihang University in Beijing. After being gone for two and a half years, I finally returned to China this month on a chartered flight. As the final day of the quarantine approaches, I am finishing up this piece. My journey from Bangladesh to China is recapped in this article, along with the lessons I learned along the way.

As we know, inbound flights to China have significantly increased this year due to China's dynamic changes to the zero-covid prevention and control policy. While there's a long way to the pre-pandemic state, the recent multiplication in international flights shows the dynamic adaption of the government's policies to the current pandemic situation. Four major Chinese airliners have already announced their plan to restart direct flights from China to Europe in August this year. Meanwhile, China Southern and China Eastern have maintained direct flights to two major countries, Pakistan and Bangladesh, since 2021. Furthermore, the routes from Guangzhou to Seoul and Tokyo have been stable for the past year. It has to be mentioned that the flights to Southeast Asia and South Asia account for the largest share of China Southern's international routes.

The gradual opening of the border offers a glimpse of hope to the thousands of stranded international students who have been stuck outside of China for more than 2 years. China has recently started to issue students visas (X1 only) on a priority and needs basis. Almost every university has received green signal from the Ministry of Education (MoE) and has already started sending the relevant documents to their students. Chinese embassies in almost all countries have also started to accept student visa (X1) applications.

When this article is written, as per the embassy's requirements, a new student (going

to China for the first time) should have a physical copy of the admission letter, JW201/202, and Notice of Consent (NoC) to be eligible for the X1 visa. Students who got admitted before 2020 only need to have NoC from their university. NoC is a permission letter issued by the university considering its quarantine capacities and students' priorities. Besides, universities have also sent emails to the embassies containing the list of students who were given permission to return. These data are used by the embassies to cross-check with the university before issuing the visa to students. Students who have to do experimental work or internships on campus as part of their studies were put in the first batch by the universities.

Volunteers at the visa application center, Photo By ABCA

As a doctoral student, my university included me in the first batch and sent out my documents in July. After receiving all the documents, I took an online visa appointment at the Chinese embassy in Dhaka in August. On the appointed date, I arrived at the designated location early in the morning. Volunteers from the Association of Bangladesh-China Alumni (ABCA) and Bangladesh China Youth Students Association (BCYSA) were there to help all the students applying for the X visa, making the intricate processes easier for all the students. Incorporating volunteer teams into the visa processes has really made the tasks student-friendly, receiving huge appreciation from the visa applicants. Following the visa interview, I was told to collect my visa from the embassy after 4 working days.

On September 21st, I received my passport and the long-awaited X visa. Then another obstacle arose: the inability to book flights. There were few flights available at the time, and the tickets were very expensive. Fare of all the available flights to China was 2-3 times higher than the pre-pandemic time. Besides, travelling to China through a third country was also challenging as the requirements of the Green Health Code vary from country to country. Therefore, finding a suitable flight was difficult until the Chinese embassy and Bangladesh foreign ministry

announced 6 chartered flights for the students. China Southern and China Eastern operated these chartered flights from the 26th of September to the 28th of October.

Considering the time and price, I confirmed the ticket for the 3rd chartered flight scheduled on 12th October. Before taking the flight, we had to fulfil some pre-arrival health requirements set by the Chinese authority, which included two doses of vaccination, two negative nucleic acid tests, and the Green Health Code issued by the Chinese Foreign Ministry. Since I had already completed the covid-19 vaccination, I presented the vaccine

certificate and went for the first nucleic acid test one day before the flight.

Generally, all passengers travelling to China must do two nucleic acid tests within 48 hours of the flight. Each test should have an interval of 24 hours. After doing the tests within the specific time, passengers can go to the airport alone. However, the passengers (students) of the chartered flight on the 12th of October had some additional requirements. They had to undergo more difficult health screening due to China's National Election (October 16th) in Beijing. Some additional safety protocols and a closed management loop were introduced for them. These include a mini quarantine from the test centre to the airport after the 2nd nucleic acid test. According to the new policies, as a passenger of the chartered flight, I completed 2nd nucleic acid test at the designated centres in Dhaka twelve hours before the flight. From the sample collection to the plane boarding, we had

to keep ourselves isolated. We were prohibited from removing masks, walking unnecessarily, eating or drinking. Additionally, we were asked to stay out of contact with anyone outside (including parents or relatives) during this period. Since it was a chartered flight and was flying to China during a critical time, the embassy personally monitored the whole process with their own staff. Counselor **Hualong Yan** also visited the test centres and greeted the students. He reiterated the importance of the health protocols. Authority also called local police to keep us isolated from the outside, ensuring the closed management loop protocols. The embassy arranged a special bus that transported all students to the airport.

Minister Counselor & Deputy Chief of Mission Embassy of China in Bangladesh ***Hualong Yan*** *visiting the test centres on 12th Oct, Prescription point (left), Lab Quest (Right). Photo By ABCA*

We arrived at the airport at approximately 6:30 p.m. and were directed to the check-in gate, which opened thirty minutes later. Following the immigration and boarding, the flight took off at 11.15 pm. All the inflight foods were packed and already on everyone's seats. After three hours of flight, we landed late at night at Guangzhou Airport. There was complete silence at the airport as only a few staff members were present to assist us with immigration. We submitted basic information using an automated machine that provided us with a QR code for use in subsequent stages. All procedures were completed through a networked data management system, so there were few possibilities to interact with other individuals. Before immigration, the airport authorities conducted another nucleic acid test. After completing all the procedures at the airport, we were taken to the hotel by the buses waiting at the exit gate, which were arranged by the quarantine operation authority.

In the early morning of October 13, we arrived at the quarantine facility, where the entire staff was prepared to greet us. This quarantine centre is within the Guangzhou International Health Hub. Besides Bangladeshi students, passengers from other commercial flights from different countries were also quarantined in this place. There are several buildings, the majority of which have three floors. The QR code given at the airport was used to check in at the building's entrance.

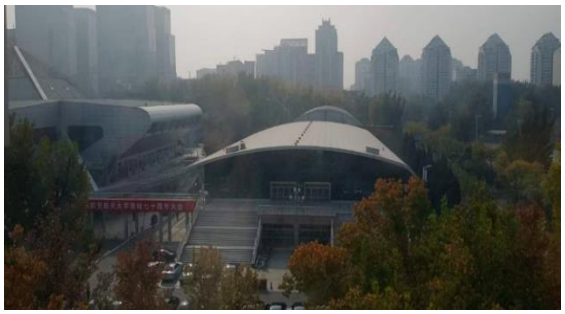

At first glance, I had mixed feelings about the room. On the one hand, I was relieved to see that each room was tastefully decorated and supplied with all the essential daily goods. On the other hand, this is a lot of mental work, especially for someone like me who appreciates the outdoors. Of course, then I'd remember that it's a standard health protocol I need to follow to prevent COVID from entering the country. To put it another way, it will make the next days of my stay in China much less dangerous. When all these thoughts were swirling in my head, it was during this time that news of yet another COVID sample collection was announced. For the nucleic acid test, we were instructed to wear masks and open the door. Furthermore, we were given information about the afternoon malaria test. The only times we were allowed to leave the room were to take the nucleic test and retrieve meals (at specific times). On top of that, we were obligated to use the in-room "all-in-one" machine to take temperature readings twice daily. The health declaration processes on both a global and domestic scale were finalized using this machine. The entire staff here is very helpful and friendly. They used a WeChat group to help us to complete all the necessary forms.

Quarantine Hotel (left), Birthday Gifts from Guangzhou International Health Hub

The hotel staff made every effort to make the journey enjoyable. They set up a number of online contests in which we could participate and win prizes. On the second day of the quarantine, one of our countrymen celebrated his birthday, and the hotel management surprised him with gifts in his room. As a person with a minor hypertension problem, I often got a phone call from their medical staff to discuss my mental health status. They also informed us regularly about the health code application.

During the quarantine periods, Muslim passengers were provided food prepared by the Halal restaurant. For breakfast, they usually offered noodles, dumplings, and eggs. Besides,

different types of soups were added more often. Chinese veggies and chicken and beef curries are served for lunch. Additionally, I've noticed that the evening meal might occasionally be heavy. My previous interactions with Chinese acquaintances have taught me that they typically eat light dinner

I was discharged from the quarantine facility on October 23 and went straight to the train station. The authority checked our Guangdong health code (GHC) before we left the hotel. When everyone received the green code in the GHC system, we were given permission to leave. Passengers heading to Beijing were required to submit the Beijing Health Code (Health Kit) in addition to the GHC at the airport or train station. Unfortunately, I got a warning in the Health Kit that I had traveled to a high-risk city in China that had seen a number of Covid cases in the previous week.

I was therefore denied entry to Beijing in accordance with the Beijing Covid policy. I was advised to hold off till the area turns into a low-risk zone for a few days. I found it a little perplexing that all other passengers from the same location didn't receive that notice. I, therefore, proceeded to the railway station to ascertain the truth. The staff at the railway station informed me that since Beijing adheres to tight COVID regulations, they were unable to permit my passage there. My university recommended that I spent a few days in Guangzhou when I contacted them as well.

Beihang University's Training Center (Quarantine Center), left, and a view of the campus from my room, right.

So, I relocated to a more secure area of Guangzhou and booked a hotel room for seven days. I also began routine nucleic testing at the neighborhood testing facility. Fortunately, I received a green code in my health kit app after 2 days in a row with a negative nucleic acid test. Then, I took a bullet train the same day, taking around eight hours to get to Beijing. My health kit was examined multiple times throughout the trip to ensure that I was travelling in good health. When I arrived in Beijing at 11:00 p.m., university staff members greeted me at the station. I was then brought to the university guest house, where I spent an additional 14 days of quarantine. It should be noted that the same health kit app was used to obtain campus access. Dinner and my daily necessities were already in my room as I arrived late at night. I took a shower as soon as I reached the room, not only to be clean but also to revive my thoughts after the last few hours of adventurous experiences.

Mehedi Hasan
Ph.D. Candidate
School of Astronautics
Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Beihang University).

মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি টেকনোলজি : চীনের ভার্চুয়াল KoL-এর ব্যবহার

বর্তমান এক বিংশ শতাব্দী হচ্ছে প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের শতাব্দী। এর ধারাবাহিকতায় পুরো উন্নত বিশ্বের চোখ এখন প্রযুক্তির উপর। বর্তমান বিশ্ব উন্নয়ন অভিযাত্রায় প্রত্যেকটা সেক্টরে চীনের অবদান অতুলনীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিস্কারে চীন এখন পুরো বিশ্বের কাছে রোল মডেল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে টেকনোলজির আশীর্বাদ অনস্বীকার্য। নাগরিক জীবন সহজ ও সমৃদ্ধির জন্য চীন দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা কাজে প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং এই প্রযুক্তিকেই জীবনের প্রত্যেকটি কাজে ব্যবহার করছে। চীন প্রযুক্তিতে এতটাই বিকশিত হয়েছে এবং হচ্ছে তা কল্পনাতীত। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি কোভিড-১৯ এর সময় চায়না কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সুফল সামগ্রিক সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বা রাখছে। বর্তমানে চীনে ৭৩০ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং ১ বিলিয়নেরও বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী রয়েছে। এই বিশাল পরিমান ডিজিটাল সংযোগ সমাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিনত হয়েছে। এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো শক্তিশালী করার নিমিত্তে চীন সেমিকন্ডাক্টর, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বায়োটেকনোলজি, এডভান্সড মেনুফ্যাকসারিং টুলস এবং মেশিনের মত টেকনোলজি উদ্ভাবনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

আমার এই লেখায় অন্যতম ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। মেটাভার্স এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বিশ্বজুড়ে তুঙ্গে। চায়নাও এর বিশাল জনপ্রিয়তা থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই।

নাইকো পার্টনার্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট লিন কসমাস হ্যানসনের মতে, চায়নিজ গেমিং ফার্ম এবং টেনসেন্টের মত বড় বড় টেক কোম্পানিগুলো মেটাভার্স দুনিয়ায় নিজেদের অবস্থান তৈরির দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছে। লাইফ সার্ভিস ভিডিও গেম গুলো অনেক আগে থেকেই মেটাভার্স এর মত জনপ্রিয় বিষয়টা নিয়ে কাজ করছে এবং একই সাথে ভিডিও গেম প্রোডাকশন এবং সোশাল মিডিয়ায় অভিজ্ঞতা আছে এই রকম টেক জায়ান্টরা যখন এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে প্রবেশ করবে তখন এই দুনিয়ায় একটা রাতারাতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে পারে।

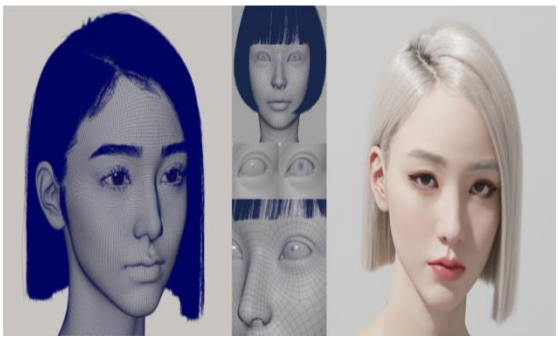

ছবি - জনপ্রিয় ভার্চুয়াল আইডল

মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কি?

সহজ কথায়- মানুষ ভার্চুয়াল জগতের একটা ডিজিটাল আইডেন্টিটি বা পরিচয় বহন করবে সেটা দিয়ে ভার্চুয়াল জগতের অভিজ্ঞতা নিবে, অংশগ্রহণ, নির্মাণ এবং বাস করবে। যেমন আমরা যদি একটা স্মার্টফোন কল্পনা করি এবং স্মার্টফোনে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকে তবে পুরো ডিজিটাল পৃথিবী হাতের মুঠায়। ঠিক একই যুক্তিতে মানুষ মেটাভার্স নামের ডিজিটাল জগতে বসবাস করবে। মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে অসংখ্য ডিজিটাল একাউন্ট থাকবে। সেই ডিজিটাল একাউন্টগুলি একটা আসল পরিচয়সহ অফলাইন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই মেটাভার্স ডিজিটাল জগতে মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং একসাথে নিজেদের সুবিধামত নিয়ম তৈরি করতে পারবে। একই ভাবে ব্যবসায়িক ফার্ম তৈরি করতে পারবে।

তবে মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বিষয়টা কি বা কিভাবে কাজ করবে এটা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কিন্ত বর্তমান উদীয়মান প্রযুক্তির বাজারে মেটাভার্স গবেষণার নতুন নতুন প্লাটফর্ম তৈরি করছে।

ছবি - চাইনিজ ভার্চুয়াল AYAYI

বর্তমানে মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির কিছু ব্যবহার :

১. ভার্চুয়াল আইডল- ভার্চুয়াল আইডলের ধরনাটা হচ্ছে এটা রিয়াল আইডলদের বিকল্প হিসাবে কাজ করবে। ঠিক এই কনসেপ্টকে ধারন করেই বাজারে এখন অনেক ধরনের ভার্চুয়াল আইডল রয়েছে। যেমন- ভার্চুয়াল গায়কদের প্রতিনিধিত্ব করছে হাতসুনে মিকু এবং লুও তিয়ানই। ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক এ উপস্থাপনার জন্য ব্যবহার হচ্ছে কিজুনা আই এবং মিরাই আকারি। ঠিক একই ভাবে ভার্চুয়াল অভিনেতা হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে হেজুই।

২. ভার্চুয়াল ইনফুলেইন্সার- এটা মুলত মুখের অভিব্যক্তি, চোখ, শরীর এবং আঙ্গুলের নাড়াচাড়া করতে পারে। একই সাথে ছোট ভিডিও ও রিয়াল টাইম ব্রডকাস্টের মাধ্যমে দর্শকদের সাথে

ইন্টারেকশন এবং বাণিজ্যিকীকরন করতে পারে। Xmov technology চায়নার প্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েঞ্জার তৈরি করে। Xmov এক বিবৃতিতে বলেছে তারা টিকটক,ওয়েইবোর মত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্লাসিক এবং আধুনিক ফ্যাশনের সংমিশ্রণে বিষয়বস্তু তৈরি করবে। আর লাইফ স্টিমিং এবং ছোট ভিডিও এর মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ করবে।

তবে চায়নাতে এই মূহুর্তে বানিজ্যিক কাছে জনপ্রিয় সাইট গুলো প্রচুর পরিমাণে ভার্সচুয়াল kol এর ব্যবহার হচ্ছে।

ভার্সচুয়াল kol (কল) কী?

Kol এর পূর্নাঙ্গ হচ্ছে- key opinion leaders(kol)। Luo Tianyi, Noonoouri, Aimee, Ling, Ayayi হচ্ছে বর্তমানে চায়নার জনপ্রিয় "কী অপেনিয়ন লিডার" বা কল (kol)। এই ভার্চুয়াল আইডলগুলো সাধারণত মুখের মাধ্যমে অভিব্যক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের ফিচার বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাধ্যমে তারা মানুষের সাথে ইন্টারেকশন করতে পারে। এদের প্রভাব কখনো কখনো বাস্তব সেলিব্রিটিদের সাথে তুলনীয় এবং তাদের অনলাইন কার্যকলাপ মিলিয়ন পিপলের মাঝে ইন্টাররেকশন করতে পারে। এই ভার্চুয়াল আইডলগুলো কনসার্টে

গান গাওয়া, শো হোস্ট করা এবং মডেলিং, সামাজিকীকরণ, লাইভ স্ট্রিমিং এবং বিভিন্ন ব্রান্ডের এম্বাসেডর হিসাবে কাজ করা। তবে তাদের সকলের কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে তৈরি ভার্চুয়াল ক্যারেক্টর আছে।

যেমন- ব্যবসায়িক জগতে প্রত্যেকটা সেক্টরে কিছু এক্সপার্ট থাকে যাদেরকে আমরা বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে উল্লেখ করি কারন তারা একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখে। ঠিক এই ধারণা নিয়েই মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে প্রত্যেকটা সেক্টরে কিছু এক্সপার্ট আছে তারা সোশ্যাল মিডিয়া, মার্কেটিং, ই কমার্স জগতে ইনফ্লুয়েন্সার হিসাবে কাজ করছে তাদের কেই বলা হয় key opinion leader (kol).

চায়নার কোন প্লাটফর্মগুলো তে Kol কে ব্যবহার করা হয়?

Kol হচ্ছে ইন্টারনেট দুনিয়ায় জনপ্রিয় হোস্ট, ব্লগার বা ভ্লগার যারা বিপুল পরিমান মানুষকে প্রলুব্ধ করে। যার ফলে প্লাটফর্মগুলো প্রচুর পরিমাণে ট্রাফিক পায়। বর্তমানে চায়নার জনপ্রিয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম Wechat, Weibo, Douyin, Tmall, Taobao, Meipai, Xiaohongshu এবং Pinduoduo এর মত জনপ্রিয় সাইটগুলোতে Kol এর ব্যবহার করা হয়।

চায়নিজ নেটিজেনরা কি ভার্চুয়াল আইডল বা ভার্চুয়াল Kol দের কি গ্রহণ করছে?

চীনের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের উপর একটা জরিপে দেখা গেছে অন্য যেকোন দেশের তুলনায় চায়নাতে অনলাইন সেলিব্রিটিদের যেকোন কোম্পানির ব্র্যান্ডিং বা মার্কেটিং নেটিজেনদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য।

iiMedia তাদের একটা গবেষণায় দাবি করছে 63.6% চায়নিজ নেটিজেন ভার্চুয়াল আইডলদের কে সমর্থন করবে। তাদের গবেষণা অনুযায়ী প্রায় ৩০%

চায়নিজ ৫০০-১০০০RMB খরচ করবে, ২৭.৩% চায়নিজ প্রায় ২০০-৫০০ RMB এবং ৫.৪% চায়নিজ বলেছেন গড় মাসিক ভার্চুয়াল আইডলদের পিছনে ২০০০ RMB চেয়ে বেশি খরচ পৌছেছে। এই রিপোর্টের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানে চায়নিজ নেটিজেনদের কাছে ভার্চুয়াল আইডল কতটা জনপ্রিয়।

আরেকটা জরিপ প্রকাশ করেছে LeadLeo। তাদের ডেটায় দেখা গেছে প্রায় 62.7% ব্যবহারকারীর মতে ভার্চুয়াল আইডল কখনো নেতিবাচক সংবাদে জড়িত হবে না এবং সর্বদা নিখুঁত থাকবে। ৪৯.৬% এটিকে ACGN সংস্কৃতিতে তাদের আগ্রহের সাথে যুক্ত করেছে এবং প্রায় ৩৬% এর ভাষ্য মতে তারা তাদের নেগেটিভ ইমোশন যেমন উদ্বেগ, একাকিত্বতা এবং খারাপ আবেগ থেকে মুক্তি পেতে তারা ভার্চুয়াল আইডল বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিকে বেছে নিয়েছে। অনেকের মতে ভার্চুয়াল আইডলদের দুর্দান্ত চেহারা,ব্যক্তিত্ব, তাদের ভিতর এক ধরনের অপার্থিব অনুভূতি দিতে পারে এই জন্য ভার্চুয়াল আইডল তাদের মন জয় করে নিয়েছে।

মেটাভার্স দুনিয়ায় চায়না পদাচরণ-

ইতিমধ্যেই Baidu (চীনা google) ২০২১ সালে মেটাভার্স চালু করেছে। এর ব্যবহারকারীরা একটা এভাডার ব্যবহারের মাধ্যমে ভার্চুয়াল লোকেশনে প্রবেশ করতে পারবে। Baidu এর মেটাভার্সে অ্যাক্সেস নিতে ফোন বা কম্পিউটারের প্রয়োজন। এমন কি VR হেডসেটগুলিও ভিআর জীবনের অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। Baidu' র এই মেটাভার্স কে XiRang ও বলা হয়।XiRang ব্যবহার করার জন্য একাউন্টের প্রয়োজন হয়।

বিগত প্রায় কয়েক যুগ বিভিন্ন মুভি বা উপন্যাসে সাইন্স ফিকশন হিসাবে ধারন করা মেটাভার্স ২০২১ সালে পুঁজিবাজারে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। ২০২১ সালকে চীনের ভার্চুয়াল আইডল শিল্পের জন্য একটা ক্রমবর্ধমাণ বছর হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারন বছরের প্রথমে ভার্চুয়াল জগতের প্রভাবশালী ইনফ্লুয়েন্জার লুও তিয়ানই চীন সিসিটিভি বসন্ত উৎসবে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ ভক্তের সামনে। এই বছরের শুরুতেই চীনের ইন্টারনেট জায়ান্ট এবং এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানিগুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে প্রবেশ করছে। iiMedia এর রিসার্চ অনুযায়ী ২০২০ সালে চীনের ভার্চুয়াল আইডল জগতে কোর ইন্ডাস্ট্রি ছিল ৩.৪৬ বিলিয়ন ইউয়ান এবং ২০২১ সালে ৬.২২ বিলিয়ন ইউয়ান। আর ২০২০ সালে এই ইন্ডাস্ট্রির ফুল কমার্শিয়াল মার্কেট সাইজ ছিল ৬৪.৫৬ বিলিয়ন ইউয়ান এবং ২০২১ সালে ১০৭.৪৯ বিলিয়ন ইউয়ান।

উপরের এই ২০২০ এবং ২০২১ সালের চায়নিজ ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মার্কেট সাইজ দেখে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আগামী দিনগুলোতে চায়নিজ টেক ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ভার্চুয়াল আইডল বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি নিয়ে কাজ যে আরো বড় পরিসরে হবে এতে কোন সন্দেহ নাই।একই সাথে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় এন্টারটেইনমেন্টের মাধ্যম হবে এই ভার্চুয়াল জগত।

মোঃ জান্নাতুল আরিফ
পি এস ডি শিক্ষার্থী,
নর্থ চায়না ইলেক্ট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি, বেইজিং, চায়না

চীনে উচ্চশিক্ষা : কিছু গতানুগতিক ধারণা এবং বাস্তবতা

দেশে আন্ডারগ্রেড পড়াশোনা শেষ করে বিদেশে মাস্টার্স অথবা পিএইচডিতে অ্যাডমিশন নিয়ে পড়তে যাব, এটা আমার অনেক দিনের লক্ষ্য ছিল। গ্র্যাজুয়েট লেভেলে আমাদের দেশ থেকে যেই সকল স্টুডেন্টরা বিদেশে পড়তে যায় তার একটা বড় অংশই সাধারণত স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যায় কারণ এই লেভেলের পড়াশোনাতে যে পরিমাণ খরচের দরকার পড়ে তা আমাদের দেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীর আয়ত্তের বাইরেই পড়ে। আমি যখন ব্যাচেলরে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা শেষ করলাম, যেকোনো কারণে আমার সিজিপিএ টপ নচ ছিল না, যদিও আমার এসএসসি এবং এইচএসসির রেজাল্ট ছিল বেশ ভালো। প্রথমত, আমার ইচ্ছা ছিল আমেরিকায় গ্রাজুয়েট স্টাডি করতে যাব। তখন দেখলাম ওখানে সিজিপিএ কম থাকলেও এর পাশাপাশি গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং জিয়ারই স্কোর খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রাইটেরিয়া হিসেবে দেখা হয় স্কলারশিপসহ এডমিশন পাওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু তখন আমার ভালো তেমন কোন গবেষণার অভিজ্ঞতা না থাকায় দুই বছর চেষ্টা করে বেশ কয়েকটা আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে আমি এডমিশন পেলেও ফান্ডিং পাইনি। তখন আমি বুঝতে পারি আমার প্রোফাইলটা হয়তোবা এডমিশন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু স্কলারশিপ এর জন্য নয়! আরো কিছু মালমসলা (পাবলিকেশন/জিআরই, অ্যাওয়ার্ড এবং অন্যান্য) যোগ করতে হবে আমার প্রোফাইলে, তাহলে আমি স্কলারশিপসহ হয়তোবা আমার কাঙ্খিত জায়গায় ভালো একটা সুযোগ পাবো।

তখন আমি একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করতে থাকলাম। বেশ কিছু বড় ভাইবোনদের দেখেছি উনারা এশিয়ার মধ্যে শিক্ষা-গবেষণায় উন্নত চীন, কোরিয়া, জাপান-এ মাস্টার্স করে প্রোফাইল ভারী করে তারপর আমেরিকা, চীন, সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশে ভালো ফান্ডিং নিয়ে পিএইচডি করতে যাচ্ছে, গিয়েছে। এই চিন্তা মাথায় রেখে মাস্টার্স এর জন্য চীনে এপ্লাই করলাম শেষ মুহূর্তে, মাত্র দুইটা প্রভিনশিয়াল গভর্নমেন্ট স্কলারশিপে এবং শেনডং প্রভিনশিয়াল গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ এর জন্য মনোনীত হই ২০২০ সালে।

অনেকেই হয়তো এটা জানেন না, কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে ২০১৮ সালের এক জরিপ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের পর চীনই ছিল তৃতীয় দেশ যেখানে সবচেয়ে বেশি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট পড়াশোনা করতে আসে সারা পৃথিবী থেকে। এই সংখ্যাটি কোভিড পরবর্তী সময়ে বিগত দু বছরে কিছুটা কমেছে চায়নার জিরো কোভিড পলিসির ফলে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের এনরোলমেন্ট কম হওয়ার কারণে। অচিরেই এটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। এছাড়াও চীনের গবেষণাবান্ধব পড়াশোনার মান সারা পৃথিবীর নজর

কেড়েছে। ২০২১ সালে চীন যত পরিমান গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে তা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি।

চায়নাতে রিসার্চ বেইজ মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিলো না, তা আমি আমার মাস্টার্স শেষ করার আগেই প্রমাণ পেয়ে গিয়েছি ইতিমধ্যে। থিসিস এর পাবলিকেশন করার আগেই আমি এরমধ্যে দুইটি পেপার পাবলিশ করেছি স্বনামধন্য কনফারেন্স এবং জার্নালে (IEEE, Springer)। শুধু তাই নয়, বর্তমানে আমি সিঙ্গাপুর, উজবেকিস্তান, কানাডা, আমেরিকাসহ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথেও বেশ কয়েকটি কোলাবোরেশনের কাজ করছি। এই সবগুলি কাজেরই সুযোগ তৈরি হয়েছে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর নিজের প্রোফাইলকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে।

আমাদের দেশের এমন অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা একটু সুযোগের এবং পরিবেশের অভাবে অনেক ইচ্ছাশক্তি থাকার পরেও গবেষণাকর্মে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারেন না। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে গবেষণামুখী শিক্ষার সংস্কৃতি এখনো বড় পরিসরে গড়ে ওঠেনি। যতটুকুই এখানে হয় তা খুবই অল্প পরিসরে এবং খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীই সেটির সুবিধা নিতে পারে। আবার অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা বছরের পর বছর সময় নষ্ট করে একটি নির্দিষ্ট দেশকেন্দ্রীক উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা করে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় গ্রাজুয়েট লেভেলের স্কলারশিপ পাওয়াটা খুবই কম্পিটিটিভ, কারণ সারা পৃথিবী থেকে বেস্ট প্রোফাইলের স্টুডেন্টরা (চীন, ভারত, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি) এখানে এপ্লাই করতে থাকে এবং আমাদের কম্পিটিশনটা হয় তাদের সাথে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য দেশের শিক্ষার মানের সাথে আমাদের শিক্ষার মানের একটা বিরাট ফারাক রয়েছে। ব্যাচেলার শেষ করার আগেই বেশ ভালো গবেষণার অভিজ্ঞতা তাদের ঝুলিতে যুক্ত হয়। তাই আমি বলব আমাদের উচিত তুলনামূলক কম কম্পিটিশন যেসব কান্ট্রিতে কিন্তু গবেষণার সুযোগ সুবিধা ভালো রয়েছে, সেই দেশগুলোতে মাস্টার্স কমপ্লিট করে পিএইচডির জন্য আরো ভালো কোন জায়গায় চেষ্টা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চীন হতে পারে আদর্শ প্লাটফর্ম। যেহেতু ব্যাচেলর লেভেলে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার ভিত্তিটা সেভাবে তৈরি হয় না, তাই চীনে মাস্টার্স করে ভিত্তিটা শক্তভাবে তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। এটা করতে পারলেই সারা পৃথিবী তখন সেই স্কিলের দাম দেবে, যার কিছুটা আমি এখনই অনুভব করতে পাচ্ছি!

মোঃ সাকিব উল্লাহ সৌরভ
ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শেনডং ইউনিভার্সিটি অফ ফিন্যান্স এন্ড ইকোনোমিক্স

ঝড়

নীল নব ঘন গগন মাঝে
আধার ঘনায়ে আসে,
অস্ফুট তব তিমিশা লগ্নে
প্রাণে জাগে বরাভয়,
চারিদিকে তব ডেকে যায় হাক
জিমুতেন্দ্র কোপি,
মন মাঝে তাই জাগে আজ ভয়
গগনের আর্তনাদে
করে চলে যেন হুতাশন খেলা
সারা অম্বর জুড়ে
প্রকৃতি পরে ছেয়ে যায়
যেন কাল এক গালিচায়
শকুন বুঝি নেমে এল আজি
মনে জাগে এই ভয়
ক্ষনিকের তরে শান্তি তব নেমে এল বুঝি
এই ধরা ভবে
হঠাৎ কি ভাবি উঠি
দেখি চারিধার বায়ু বেগে আজ
প্রলয়ে ভস্মিভূত
অনাকাঙ্খিত ছায়া তব যেন
কেড়ে নিয়ে যায় সবই
প্রকৃতি রুপে হানিছে যে তব
মৃত্যুছন্দ শূল
চারিধার আজ লন্ডভন্ড
সমগ্র প্রাণিকূল
প্রাণ যায় আজ
যায় বাড়িঘর
উড়িছে তব গগনে।।
তিমিশা লগ্নের তীব্রতা তব
ভয়াল রুপ এক ধরে
থেমে গেল তাহে জগৎ জীবন
মানব আর্তনাদে
শত সহস্র জীবন তব
লুটায় এ পাকভূমে
তবুও আজ চলিছে জীবন
তরিয়া সকল শঙ্কা
আয় আয় ঝড়
আয় তবে আবার
করিব নির্মূল আজই
সাহসের টানে জীবন যুদ্ধে
নব রুপে তাই নামি।।

সিমন সাহা
এমবিবিএস, ক্যাপিটাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি,
বেইজিং, চীন।

প্রতিদান

বিকেলের পড়ন্ত রোদে অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে নিচে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাওয়া গাড়ি গুলোর দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে নীপা। এইখানে সে প্রায় এসে দাড়িয়ে থাকে,জায়গা টা তার খুব পরিচিত। মানুষ প্রকৃতির এত কাছাকাছি আসলে বলে খুব একাকীত্ব বোধ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! নীপার এই মূহুর্তে কারও জন্যে খারাপ লাগছে না,মায়াও হচ্ছে না। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি,বিকেলের এই সময় টা একটু শীতশীত ভাব থাকে, তাই হালকা একটা চাঁদর গায়ে জড়িয়ে নিতে বেশ আরাম বোধ হয়। নীপার বয়স ৩০ এর কোঠায়, জীবনের মধ্যান্নে পৌছে গেছেন। নীপা ভাবে আমরা যারা নব্বই এর দশকের মানুষ,তারা শীতকালে চাদরটা বেশি পছন্দ করি । মনে মনে হাসে, সে আর স্মার্ট হতে পারলো কোথায়! সারাজীবন তো দায়িত্ব পালন ই করে গেলো।

আর যাদের জন্য সারাজীবন টা বিসর্জন দিলো তারা কি মনে রাখেন তাকে। হয়ত হ্যাঁ। হয়তো বা না। হঠাৎ কেমন যেন ছোট বেলার কথা মনে পড়ে গেলো। নিজের গ্রাম, খেলার সাথী, আম বাগান, আযানের ধ্বনি, মায়ের ডাক, বাঁশির সুর, সব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। প্রায় চার বছর ধরে দেশের বাইরে পড়াশোনা করছে, লেখাপড়ায় নীপা বরাবরই খুব ভালো, তাকে টক্কর দেওয়া খুব মুশকিল। তার জন্য তো এতদুর আসা। বাবা কোনদিন ঐ ভাবে টাকাপয়সা দেয়নি পড়াশোনার জন্য, কিন্তু বাধাঁও দেয়নি। না তার যে দেওয়ার মত ক্ষমতা ছিল না, তা নয় আসলে নীপা মেয়ে মানুষ এত পড়ে কি লাভ! কিন্তু নীপা তো নীপা,সে হাল ছাড়েনি। নিজে পড়েছে, সাথে সাথে ভাইবোন ও মানুষ করেছে। পরিবারের সাথে তার একটা ভালো লেনদেনের সম্পর্ক আছে। যখন দরকার হয়,তখন সবাই খবর নেয়। নীপা কাউকে ফিরায় না, যে যখন যা চায় সেটা পূরণ করার চেষ্টা করে। যদি মাঝে মাঝে না পারে তো ইমোশনাল ব্লাকমেইল তো আছেই। যা তার মোটেও পছন্দ না, তার থেকে দিয়ে দেওয়ায় ভালো। মাঝে মাঝে ভাবে, আচ্ছা এরা যখন মানুষ হবে আমাকে কি মনে রাখবে! হয়তো রাখবে,হয়তোবা না। জীবনের মধ্যভাগে দাড়িয়ে একাকী রয়ে গেলো, পরিবারের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে পাশে কাউকে খোঁজার সময় পায়নি। এখন এই সময় এসে সেই ষোড়শীর ন্যাঁকা ন্যাঁকা প্রেমটা করা সম্ভব তো নয়, তা সে ভালো করে বুঝে গেছে। একা একা থাকাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কারও সাথে আর কম্প্রোমাইজ করে থাকা সম্ভব নয়। হঠাৎ নীপার ছোট বেলার এক ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো।

সে যখন অনেক ছোট, তার গ্রামে এক মেয়ে ছিল,

যে অনেক বড় একটা কম্পানিতে চাকরী করত। ঐ নব্বইয়ের দশকেও সে অনেক টাকা বেতন পেতো। সবাই তার খুব প্রশংসা করত। মেয়েটার তিন বোন ছিল, সবাইকে একে একে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিল। বুড়ো বাবা মায়ের দেখাশোনা করতে করতে নিজের কথা ভুলে গেল। সবাই যখন অনেক ভালো

আছে, তখন তাকে সবাই বিয়ে দিতে চায় । কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল, বয়স ৩০ পার হয়ে গেছে। তার লেবেলের সাথে যায় ঐ বয়সের কাউকে খুজে পাওয়া খুব কঠিন হয়ে গেল। তারপর তার থেকে ২ বছরের ছোট একটা ছেলে কে সে বিয়ে করেছিল। মেয়ের বয়স ৩৩ বছর, ছেলের বয়স ৩০ বছর, কি অদ্ভুত তাই না? না, অদ্ভুত হতো না যদি বিয়েটা ভালোবেসে হতো। সেখানে একটা বড় হিসাব নিকাশ ছিল। গরীব বাবার মেধাবী ছেলে, দেখতে শুনতে ভালো, পড়াশোনায় ও ভালো। বিয়ের পর বউ এর টাকায় বর গেলো লন্ডনে পড়তে। সেখানে যেয়ে নিজের পছন্দ মতো আর একটা বিয়ে করে নিলো। এদিকে আপু কে ডির্ভোস দিয়ে দিলো। আপুর বয়স বেশি থাকায় বাচ্চা ও আর হয়নি ঐ অল্প সময়ে। জীবনে সফলতার শীর্ষে পৌঁছেও মানুষটা এত সুন্দরী হওয়া স্বত্বেও সারাজীবন একা থেকে গেল। আজ চারপাশে সবাই ভালো আছে,বোনদের ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি নিয়ে সুখের সংসার, কিন্তু সে একা রয়ে গেল। হয়তো সে ভালো আছে, শুধু নিঝুম রাত গুলো অনেক বড় হয়ে যায়, ফুরাতে চায় না। প্রতিদিন নিয়ম করে তিনবেলা খোঁজ নেওয়া তো দুরের কথা, ঝগড়া করারও কেউ থাকে না।

হঠাৎ 'আভাস' এর মুখ টা মনে পড়লো। 'আভাস' তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম বন্ধু ছিল। একটা রং নাম্বার এ পরিচয় হয়েছিল। দিনের পর দিন একটা অচেনা মানুষ এর সাথে কথা বলাটা নিপার অভ্যাসে পরিনত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে এত স্মার্ট ফোন ছিল না, যে ভিডিও কলে সরাসরি কাউকে চাইলে দেখা যাবে। হঠাৎ নিপার খুব হাসি পেল। তার সময় চিঠিতে প্রেম হতো, কত চিঠি যে সে পেয়েছে তার কোন ঠিক নেই। নীপা দেখতে যতটা না সুন্দরী ছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি মেধাবী ছিল। এটাতে তার খুব ফায়দা হতো, মানুষ ওর কথা শুনেই বেশি মুগ্ধ হতো। সে বরাবরই খুব বুদ্ধি মতি ছিল। তার বয়স যখন ছয় বছর, ২০ বছরের এক ছেলে তার প্রেমে পড়ে যায়। নীপার সেই দিনগুলোর কথা এখনও মনে আছে। তখন কার সময় প্রেমে এত নোংরামি ছিল না। কাছাকাছি যাওয়া তো দুরের কথা, দূর থেকে দেখায় মুশকিল হয়ে যেত। একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করতো। এখন প্রেম কত সহজ হয়ে গেছে, নীপা ভাবে এই জন্য এখন মানুষ ছেড়েও যায় বেশি একজন অন্যজনকে ফেলে। নীপার যখন ক্লাস সিক্স এ পড়ে তখন সে বুঝতে পারলো ছেলেটা তাকে পছন্দ করে। কিন্তু নতুন স্কুল, বন্ধু বান্ধবী নিয়ে এতই ব্যাস্ত হয়ে গেল যে আর ঐ সব দিকে পাত্তা দেওয়ার সময় হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় এ ভর্তি হওয়ার পর ও যখন বাড়ী যেত, ছেলে ওকে এক পলক দেখার জন্য রাস্তায় দাড়িয়ে থাকত। কিন্তু তখন আর নীপার সামনে আসার সাহস পেত না। হ্যাঁ একটা মানুষ তার জন্যে বিশ বছর অপেক্ষা করেছিল। নীপা দেখেও দেখেনি, শুধু পড়াশোনা করে গেছে আর ভাইবোন পেলে গেছে। নীপার ঐ দশ বছর বয়স থেকে বুঝে গিয়েছিল এই প্রেম ভালোবাসাটা তার জন্য নয়।

তাকে এই দুনিয়ায় সম্মানের সাথে বাঁচতে হলে সবার আগে মানুষ হতে হবে। আর 'আভাস', তার তো কোনো দোষ ছিল না। নীপার সাথে কথা বলতে বলতে প্রেমে পড়ে গেল। প্রায় ২ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এর ২য় বর্ষে নীপার সাথে একদিন অফিসিয়ালি দেখা হয়ে গেল। ডিসেম্বর এর শীতের সকাল, শহরের বড় রাস্তার এক পাশে দাড়িয়ে আছে নিপা। ছেলেটার সাথে এত কথা বলেছে, এত কাছের, তবুও নীপার ভয় ভয় করছে। যদি তাকে দেখে পছন্দ না হয়,মনের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে আল্লাহ ভালো জানে। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ দেখে রাস্তার ঐ পাশ থেকে কেউ একজন হাত নেড়ে তার নাম ধরে ডাকছে, 'এই নীপা এদিকে আসো'। নীপা কাছে আসতেই দেখলো একটা দোহারা শ্যাম বর্ণের ৬ ফুটের মতো

লম্বা ছেলে তার নাম ধরে ডাকছে। হ্যাঁ, এই তো সেই!যার যাথে দিনের পর দিন একটা রং নাম্বারে কথা বলেছে। নীপা মনে মনে হাসছে, কতই না বোকা ছিলো সেদিন। আসলে নব্বই এর দশকে এত স্মার্ট ফোন পাওয়া যেত না এখন কার মত যে হুটহাট যাকে তাকে ভিডিও কল এ দেখা যাবে। নীপা ভাবছে সে সময় টা অনেক ভালো ছিল, আর কিছু না থাক মানুষ এক জন অন্যজন কে চাইলেই ছেড়ে যেত না। মন থেকে ভালোবাসতো। সেই আভাস এর সাথে তার প্রায় অনেক গুলো বছর কেটে গেল। একদিন সে বিয়েও করতে চাইলো। কিন্তু নীপা নিজেই রাজি হয়নি।

ছোট ছোট ভাইবোন এর পড়াশোনা, নিজের ক্যারিয়ার, সব কিছু মিলিয়ে নীপার তখন নাজেহাল অবস্থা। নীপা সময় চাইল। আভাস বললো আমার মা অসুস্থ, বিয়েটা আমার করাই লাগবে নীপা। আমার মাকে দেখার কেউ নাই, একবার আমাদের কথা ভাবো নীপা। সে কি বলবে, আভাস তো এখনও তেমন কিছু করে না। তার ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা, বোনের বিয়ে বুড়ো বাবা মার খরচ, নাহ, নীপা ভাবতে পারছে না। আভাস কে হাতে পায়ে ধরে একটু সময় চেয়ে নিয়েছিল। আভাস বলেছিল এটা তোমার শেষ সুযোগ, তোমার সময় তিন মাস। তারপর শেষ দেখা আর হয়নি আভাসের সাথে। হঠাৎ নীপার স্কলারশিপ হয়ে গেলো দেশের বাইরে। চলে আসা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অন্তত ভাইবোন গুলো তো মানুষ হবে। আভাস কে বলাতে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। নীপাও হঠাৎ কেন জানি সেদিন রেগে গিয়ে অনেক কথা বলে দিয়েছিল। আচ্ছা সে কী এখনও তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। না, হয়ত নেই! ধীরে ধীরে নীপা তাকে নিজেই সব জায়গা থেকে ব্লক করে দিয়েছে।

প্রায় চার বছর হয়ে গেল, নীপা ভাবছে সে কি এখনও তাকে মিস করে। হঠাৎ এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। নীপা জোরে একটা হাসি দেওয়ার চেষ্টা করল, যাতে হাসির আড়ালে কান্নাটা ঠেকে যায়। আসলে কী যায়! কতরাত জেগে থেকেছে সে, ঘুমই আসে না। এই বিদেশের মাটিতে একাকীত্বের রাত অনেক বড় হয়, নিঝুমও হয়। শেষ হতে চায় না। পৃথিবীতে খারাপ মানুষের পাশে সবাই থাকে তাই সে হোক না ক্ষনিকের জন্য। কিন্তু তুমি যত ভালো থাকার চেষ্টা করবে তোমার বন্ধু সংখ্যা আস্তেধীরে কমে যাবে। এখন নীপা সেটা বোঝে। এবার বাড়ি গেলে বাবা বলেছে নীপার একটা ভালো বিয়ে দিবে। নীপার ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি। ভাবছে সবাই তো এখন ভালোই আছে। আর বাড়ি যেয়ে কি লাভ! অনেক তো অন্যের জন্যে হলো, এবার একটু নিজেকে নিয়ে ভাবি। অনেক তো মানুষ দেখলাম, এবার একটু দুনিয়াটা দেখবো। এভাবে বিকালের নরম রোদে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চাই বারবার।

শিরিন আক্তার
পি এইচ ডি শিক্ষার্থী
চাইনিজ একাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সাইন্স, চেচীয়াং, চীন

সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন-১ : আপনি কেমন আছেন?
উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

প্রশ্ন-২ : নানান দেশের অভিজ্ঞতায় আপনি সমৃদ্ধ। আপনার শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন সম্পর্কে আমাদের পাঠকগণ জানতে চান।

উত্তর : ধন্যবাদ। আমাদের অনেক ছাত্র ছাত্রীদের মত আমার এবং পরিবারের ইচ্ছা ছিল এইচ এস সির পরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার। সেটা করতে গিয়ে অনেকের মত আমারও প্রায় একবছর (পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হওয়া পর্যন্ত) সময় "নষ্ট" করে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। আমাদের সময় বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (২০০০ সালের দিকে) সেশন জট ছিল। পরে আমি সেখান থেকে একটি বেসরকারি (নর্থ-সাউথ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করি। তারপর প্রায় এক বছর একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরী করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য চীন সরকারের বৃত্তি নিয়ে উহান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করি। এখানেই আমার প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আপাতত শেষ করি।

পিএইচডি পড়াকালীন সময়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। সেখানেই আমি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করি। পরে আমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে কাজ শুরু করি। একই সময়ে আমি চিংদাও ওশান বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে এক বৎসর কাজ করি। কিন্তু পুরোদস্তুর (ফুল টাইম) শিক্ষক হিসেবে আমি গুয়াংডং ফরেন স্টাডি বিশ্ববিদ্যালয় এ কর্মজীবন শুরু করি। সেখানে প্রায় ২ বৎসর কাজ করে ২০১৯ সালে গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অব ফাইন্যান্স এন্ড ইকোনোমিকসে অর্থনীতি বিভাগে যোগদান করি। এখন পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছি। পাশাপাশি মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি এক্সটার্নাল সুপারভাইজার হিসেবে যুক্ত আছি।

প্রশ্ন-৩ : চীন ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কেমন বলে আপনি মনে করেন? চীনে আপনার ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা ও এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

উত্তর : ধন্যবাদ। চীন এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্য রয়েছে। গুণগত কিংবা মানগত দিক বিচারে যাব না। আমার মনে হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নিজেকে বিকশিত করার সুযোগটা চীনে বেশি। কিন্তু বেশিরভাগ বিদেশি ছাত্রছাত্রীই ভাষাগত সমস্যার কারণে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলামের (বিদেশি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আলাদা) কারণে তার সুফল পায় না। আবার চীনা ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষকরা ক্লাসে সৃজনশীল প্রশ্নে খুব একটা অভ্যস্ত না। সেদিক দিয়ে আমাদের দেশে সেটার সুযোগ একটি বেশি। কিন্তু চীনে লাইব্রেরী, ল্যাব, ফান্ডিং এর সুযোগ সুবিধা বিশ্বমানের যদিও বেশিরভাগই চিনা ভাষায়। তাই কেউ যদি রিসার্চ, ল্যাব ওয়ার্ক, এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক, সৃজনশীল সাবজেক্ট ইত্যাদিতে নিজেকে নিয়োজিত করে সেদিক থেকে আমাদের বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে।

প্রশ্ন-৪ : আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে জানতে চাই। কীভাবে তারা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি গবেষণাসহ সকল ক্ষেত্রে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারবে?

উত্তর : বাংলাদেশী অনেক ছাত্র ছাত্রী এখন চীনে পড়াশুনা করে। সবার লেভেল, সাবজেক্ট, চিন্তা চেতনা, ইচ্ছা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও এক না। আমার মনে হয় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের আগামী পাঁচ বছর পরের অবস্থা বিবেচনা করে নিজেকে সাজানো উচিত। যে যেই সাবজেক্ট এ আছে সেটারই বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আগানো উচিত। যেমন কেউ যদি মনে করে সে গবেষণায় আসবে তাহলে তাকে পিএইচডিকালীন সময় থেকেই কিছু ভালো মানের জার্নালে পাবলিকেশন এর জন্য মনোনিবেশ করতে হবে। আবার কেউ যদি মনে করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরী করবে, তাহলে স্নাতককালীন সময়েই বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্স, বিভিন্ন ভাষা, ইন্টারপারসনাল কমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট, চীনা ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সবারই মনে রাখা উচিত, চীনে পড়াশুনাকালীন এই ৪-৫ বছরই তাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এইসময়ে যে নিজেকে ভালো কাজে নিয়োজিত করবে, নিজের সময়কে সঠিক পথে বিনিয়োগ করবে সেই অন্যদের থেকে এগিয়ে যাবে। পরিশেষে একটি কথা, সব সম্ভবের দেশ এই চীন।

প্রশ্ন-৫ : চীনে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের প্রধান বাধা কোনটি বলে আপনি মনে করেন? গবেষণাসহ নানান বিষয়ে চীনের নম্বর ওয়ান অবস্থান সত্ত্বেও কেন আমাদের দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী এদিকে ঝুঁকছে না?

উত্তর : আমার মনে হয় প্রধান বাধা হল ভাষাগত সমস্যা। কিন্তু কারো যদি ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে সেটাও ওভারকাম করা যাবে। আমার মনে হয় চীন এখনও ইমিগ্র্যান্ট ফ্রেন্ডলী দেশ না। সেজন্য অনেকেই মাস্টার্স পিএইচডি করে অন্য দেশে যাবার চিন্তা করে। আবার অনেক ছাত্র ছাত্রীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থানের কারণে ও এখানে

গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করে না। আবার অনেকের মাঝে গবেষণার প্রতি অনীহা, গবেষণার প্রাথমিক ধারণা, সুযোগ সুবিধা, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকাও একটি কারণ। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী চীনে না ঝুঁকলেও দিনে দিনে সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান। ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন-৬ : অনেকদিন পর দেশে আটকে পড়া শিক্ষার্থীগণ চীনে ফিরেছেন। চীনে করোনা রেস্ট্রিকশন এখনো শেষ হয়নি। তারপর অনেকেই অনেকদিন পড়াশোনার ট্র্যাকে ছিলেন না। সর্বোপরি, সামনের দিনগুলোর জন্য তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ কী কী?

উত্তর : অনেক স্কিল এর মত পড়াশুনাও অভ্যাসের মত। অনাভ্যাসে বিদ্যানাশ। যেহেতু অনেকদিন ধরেই অনেক ছাত্রছাত্রীই পড়াশুনার ট্রাকে ছিল না, তাই তাদেরকে আবার পুরনো ধারায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসা উচিত। যদিও প্রথম প্রথম হয়ত একটু কষ্ট হবে। তাই এইসময়ে উচিত নিজের পছন্দের জিনিসগুলো দিয়ে পড়াশুনা শুরু করা। পাঠ্যবই-ই পড়তে হবে, ব্যপারটা এমন না। সেটিও করতে ইচ্ছে না হলে বিভিন্ন কমার্শিয়াল কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যেতে পারে। যেমন কেউ বিভিন্ন সফটওয়ার শিখতে পারে (SPSS, eviews, R, python), কিংবা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা, কিংবা কোনো সৃজনশীল কর্মকাণ্ড দিয়ে শুরু করতে পারে। আমার ব্যাক্তিগত ধারণা হল, পড়াশুনা আর অভিজ্ঞতা হল এমন কিছু জিনিস যেগুলো কখনো বৃথা যায় না। একদিন না একদিন ঠিকই পড়াশুনা তার প্রতিদান দিবে। কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রতিদানের কথা চিন্তা না করে কোনো একটা জিনিসের প্রতি লেগে থাকা উচিত। শিক্ষার যেমন কোন সীমানা নেই, ইচ্ছাশক্তিরও না। এই দুটির মিশেল হলে ভালো কিছুই হবার কথা। শুভকামনা সবার জন্য।

প্রশ্ন-৭ : 'মহাপ্রাচীর'-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : মহাপ্রাচীর এর বিভিন্ন লিখা আমার মাঝে মাঝেই পড়া হয়। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশ, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, অনুপ্রেরণা দান এবং নেবার একটি সুবর্ণ সুযোগ এই মহাপ্রাচীর। যারা এটার সাথে যুক্ত, তাদের ধন্যবাদ। এটি চালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ থাকলো। ধন্যবাদ BCYSA-কে। শুভকামনা সবার জন্য।

(গুয়াংদং ইউনিভার্সিটি অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের সহযোগী অধ্যাপক ড. মিরাজ আহমেদ মহাপ্রাচীরের পাঠকবৃন্দের সঙ্গে তার শিক্ষকতা ও নিজের জীবন সম্পর্কে জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মহাপ্রাচীরের নির্বাহী সম্পাদক এ বি সিদ্দিক।)

অদৃশ্য অনুরাগ

এক যে ছিল জলকুমারী জলে বাস করে
হঠাৎ করে ইচ্ছে হলো, জল ছেড়ে স্থলে এলো।
সরিৎ কিনারায় করল বাড়ি, থাকতো সেথায় দিবারাত্রি।
জলকুমারী বড় হলো, পড়া শিখতে ইচ্ছে করলো।
পিতৃ তাহা জানার পরে, বিদ্যালোকে ভর্তি করে।

স্রোতোবহার ওই পারে, সব সখিদের সাথে করে।
নিত্যদিনের আসা-যাওয়া বিদ্যা শিখার তরে।
জলকুমারীর স্বপ্ন ছিল, পড়ালেখা করবে ভালো।
পরীক্ষা যখন শুরু হল, সব বিষয়ে ভালো ছিল।
এক বিষয়ে ফেল করলো তাতেও সে খুশি ছিল।

ব্রীড়া তাহার নাহি ছিল দ্বিতীয়বার আবার দিল
সর্বশেষে পাস করিল সে তো অনেক খুশি হল।
সময় হলো এখন তাহার, কলেজেতে ভর্তি হওয়ার।
তার মধ্যে এক গল্প ছিল, বলতে আমার ভুল হলো।
ক্ষমা চেয়ে করছি শুরু'জানতো তাহার শিক্ষাগুরু।

বিদ্যালোকে আসা-যাওয়া, পথিমধ্যে দেখা,
লাল ললাটে পাগল হলো তাহারি এক সখা।
জলকুমারী তা জানার পরে, রাত্রে নাহি নিদ্রা ধরে।
অভ্রপানে তাকিয়ে গুনে অভ্র ভরা তারা,
সব যদি তার প্রেম হত আমি হতাম সারা।
রাজকুমার ওই সিন্ধু পানে, তাকিয়ে তার দুই নয়নে।
ভাবতে থাকে জলকুমারী, তুমি যদি হও আমারি।
ভালোবাসা পাবে তুমি ভরা পারাবার।
জলকুমারী বুঝতো সবি মানতো না সে প্রীতি।
কি জানি কি বুঝতো সে যে জানতো নিয়তি।

একদিন সে ডেকে পরে অনেক কিছু বলল তারে।
রাজকুমার সব শুনার পরে, ছেড়ে দিলো উড়তে তারে।
অশ্রুসিক্ত নেত্রকোনে আবার হাতের ছাপ!
চারটা বছর একা একা ভালোবাসা যায় কি সখা?
তুমিও যদি বাসতে ভালো, বলতে কেন ভয় ছিল?

রাজকুমার ও অনেক জেদি, হলে হব জেল কয়েদি।
ভালোবাসার আদালতে ডাকবো তোমাকে।
শেষ বিদায়ে দেখা হল চোখের পলকে।

সর্বশেষে দুঃখ নিয়ে রাজকুমার ঐ দিল পাড়ি সুদূর বিদেশে,
আসবে না সে বলছে তাকে, যদি না তার কান্তা ডাকে।
হঠাৎ করে ভাঙলো স্বপন, চেয়ে দেখে আগের মতন।
গল্প ছিল আরো বলার সাধ্য নেই সামনে চলার।
আজকের মত শেষ হলো আগের মত সামনে চলো।

শেখ তাওহীদুল ইসলাম
মাস্টার্স শিক্ষার্থী, চীন।

মানসিক স্বাস্থ্য ও আপনার ভূমিকা!

আজও ভাল লাগছে না। হতে পারে আজ সারাদিন বেশি ব্যস্ততায় কেটেছে, খাওয়া-দাওয়া বা দৈনিক রুটিনের হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে? কিন্তু, যদি এমন ভালো না লাগা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বা প্রতিনিয়ত হতেই থাকে তাহলে ভাবিয়ে তোলার মত বিষয়!

আচ্ছা, আপনার কী এমন হয়েছে, যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রাতে ঘুমাতে ইচ্ছে করে না, সময় কাটাচ্ছেন অন্য কোনো উপায়ে; যেমন মোবাইল, ভিডিও গেমস, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, গল্প-গুজব বা অন্য কিছু করে; একমাত্র কারণ আপনি এখন ঘুমাতে চাচ্ছেন না! আর হঠাৎ ভোর হতেই মনে হলো; সকালে অনেক কাজ আছে, ক্লাস বা অফিস বা কারও সাথে দেখা করতে হবে, আর যেই কথা সেই কাজ, পরলেন ঘুমিয়ে! সকালে ঠিক-ই উঠে কাজ করতে গেলেন, কিন্তু আপনার সর্বোচ্চ ভালো হলো না কোনো কাজ-ই, বা এমনও হতে পারে আপনাকে স্বাভাবিক এর চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হলো, বা কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে কাজটি করতে হলো না। আর দিন শেষে আপনি ফিরলেন ক্লান্ত হয়ে, রাত এ ঠিক এক-ই অবস্থা বা এক-দুই দিন পর সেই অবস্থা পুনরায় অনুভব করছেন ! সেই সাথে দিনের পর দিন আপনি অনুভব করছেন যে, আপনার সকল কাজ-কর্মে অনিহা বা সর্বোপরি উন্নতি কমে যাচ্ছে, পরিবার বা কাছের মানুষের সাথে মতের অনেক অমিল হচ্ছে, মাথাব্যথা বা মাংস পেশী ব্যথা, দুর্বল অনুভব করছেন, বা স্বাস্থ্যজনিত অন্য কোনো সমস্যা অনুভব করছেন! যা আপনার কাছে অবাক করার মতো মনে হচ্ছে! আপনি কি জানেন, এ সব সমস্যা আপনার শুধু রাতে ঘুম না আসার জন্য নয়, আপনার মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ থাকার জন্য হচ্ছে! যাই হোক, পূর্বের কথায় ফিরে আসা যাক, আপনার ভালো না লাগার কারণ খোঁজা যাক, হতে পারে আপনি বিষন্নতায় ভোগেন- প্রায়শই মন খারাপ থাকা, হঠাত ভাল লাগা

আবার খারাপ লাগা কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া-ই, কোন কাজ করতে মন না চাওয়া, বা এমনও হতে পারে যে দুশ্চিনতায় ভুগছেন–দৈনন্দিন সাধারণ বিষয় নিয়ে সবসময় ভয় পাওয়া বা খারাপ কিছু চিন্তা হওয়া, যদি এমনি হয় তাহলে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবা দরকার।

চলুন জানা যাক, মানসিক স্বাস্থ্য কী?

মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে আপনার আবেগ, মন ও সামাজিকতার সমন্বয়। আপনি কীভাবে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন, কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, বা কোনো সমস্যার সমাধান খুজছেন আর সে অনুযায়ী কী কাজ করছেন তার ওপর ভিত্তি করে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য।

আচ্ছা, মানসিক স্বাস্থ্য কেন খারাপ হয়?

মানসিক স্বাস্থ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা অথবা সামাজিক সমস্যা এর জন্য খারাপ হয় না; বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, যেমন বংশগত বা জিনগত সমস্যা (পরিবারের সদস্যের মানসিক সমস্যা বা বিষন্নতা বা অবমাননার স্বীকার হওয়ার ঘটনা), শৈশবে কোনো অবমাননাকর ঘটনার শিকার হওয়া (শারীরিক বা যৌনগত), পিতা-মাতার মাঝে অতিরিক্ত মাত্রার ঝগড়া থাকা বা বিচ্ছেদের ঘটনা, বাচ্চাদের সঠিক ভাবে লালন-পালন না হওয়া, কোন ভাবে ব্রেইনে আঘাত পাওয়া (বাচ্চাদের জন্মের সময় বা প্রাপ্ত বয়সে), দীর্ঘদিন যাবত কোনো ধরনের রোগে আক্রান্ত থাকা, পুষ্টিকর খাবার অভাব।

অনিয়ন্ত্রিত মানসিক স্বাস্থ্য যেমন অনেক শারীরিক রোগের কারণ, তেমনি মানসিক রোগেরও জন্ম দেয়, যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ক্ষতির কারণ ও বটে! কিছু সাধারণ মানসিক সমস্যা হলো- obsessive-compulsive disorder (OCD) (কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়ায় ভয় পাওয়া, কোনো কাজের ধাপ ভুল হয়েছে মনে করা, একই কাজ বার বার করা), bipolar disorder (BPD) (কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়ায় হতাশায় ভোগা, হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত ভালো আবার খারাপ অনুভব করা), panic disorder (কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়ায় আতঙ্কে থাকা বা সবসময় কারো দ্বারা আক্রোমণের আশঙ্কায় থাকা), major depressive disorder (কোনো কাজেই আনন্দ না পাওয়া, সব সময় বিষণ্ণতায় ভোগা, শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা, আত্মহত্যা প্রবণতা জন্মানো), schizophrenia (অস্বাভাবিক চিন্তাভাবনা বা সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রবণতা, বা এমন কিছু চিন্তা করা বা নিজের সামনে উপস্থিত মনে করা, যা অবাস্তব) ।

তাহলে, মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ বা ভাল কি-না, বোঝার উপায় কী?

যদি আপনি এমন অনুভব করেন, আপনার খাওয়া বা ঘুম পরিমিত বা প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি হচ্ছে, কোনো কাজেই উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছেন না বা কোনো কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না, কাউকে সহ্য করতে পারছেন না বা কাছের মানুষদের সাথেও সময় কাটাতে ইচ্ছে করছে না, অসহায় বা একা অনুভব করছেন, কোনো ঘটনা ভুলতে পারছেন না, নিজের ভাল বা খারাপ কিছু নিয়েই ভাবতে পারছেন না, নিজের বা অন্য কারো ক্ষতি করতে ভয় পাচ্ছেন না, সর্বোপরি দৈনন্দিন কাজের ব্যঘাত ঘটছে, তাহলে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। আর, একইভাবে যদি আপনি স্বাভাবিক কাজে আনন্দ খুঁজে পান। সামাজিক ও পারিবারিক কাজ বা দায়িত্বগুলো সাবলীলভাবে পালন

করতে পারেন, কর্মক্ষম চিন্তা ভাবনা থাকে, তাহলে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো আছে বলে মানা যায়।

এছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য বোঝার কিছু বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। সেটা জানার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্ন, আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য কেমন আছে তা কিভাবে বোঝা যাবে? রক্তচাপ বা রক্তের গতি, ব্যথা ও অন্যান্য বিষয় গুলি পরীক্ষা করে, তাই তো? আর, মানসিক স্বাস্থ্য কেমন তাও পরীক্ষা করা যায়, এর জন্য কিছু আধুনিক যন্ত্র যেমন, Functional magnetic resonance imaging (fMRI), Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) বা কিছু প্রশ্নভিত্তিক উত্তর এর ফলাফল প্রয়োজন হয় (যদিও এসকল পরীক্ষা শতভাগ নির্ভুল তথ্য দিতে পারে না, কারণ আপনার ব্যক্তিত্ব, জিনগত বৈশিষ্ট ও আরও কিছু বিষয় ফলাফল কে কিছুটা প্রভাবিত করে)। আসলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ বা খুব ডিপ্রেশন এ থাকলে, মস্তিষ্ক এর কিছু গুরুত্ব পূর্ণ অংশ যা hippocampus, amygdala, prefrontal cortex নামে পরিচিত, সে সকল জায়গায় কিছু রাসায়নিক পদার্থ বা হরমোন (cortisol and norepinephrine) এর নিঃসরণ বেড়ে যায়, মস্তিষ্কে প্রবাহিত রক্তে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর মাত্রার পরিবর্তন হয়, এসকল পরিবর্তন বিভিন্ন মাত্রার সিগনাল প্রেরণ করে, যা fMRI বা fNIRS এর মাধমে নির্ণয় করা যায়; আর প্রশ্নভিত্তিক উত্তর প্রক্রিয়াটি-তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্বাচিত কিছু প্রশ্ন আপনাকে করা হবে (কোনো ভুল বা সঠিক উত্তর নেই), আপনার মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে আপনি স্বাভাবিকভাবে অন্যরকম উত্তর দিবেন, আপনার সকল উত্তরের ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নম্বর দেয়া হবে ও আপনার মানসিক স্বাস্থ্য নির্ণয় করা হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাস্থ্য এর মাঝে সম্পর্ক কী?

আমাদের শরীর এর কোন অংশকে আলাদা চিন্তা করার উপায় নেই, মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাস্থ্য এর সম্পর্ক অনেকটা সমানুপাতিক, মানে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হলে শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে বা শারীরিক স্বাস্থ্য খারপ থাকলে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে। মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে আমরা যেমন উপরে বর্ণিত সমস্যায় ভোগতে থাকি, সেই সাথে নিজের শারীরিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য যা করনীয় সেই দিকগুলি তে অনিহা চলে আসে, প্রয়োজনীয় কাজ গুলি গুরুতহীন হয়ে উঠে, মানসিক স্বাস্থ্য আগে ঠিক না হলে অন্য কোন কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় না, আর মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক করার জন্য ধূমপান, মাদক বা অন্য নেশায় আগ্রহ চলে আসে, ঘুম, খাওয়া-দাওয়া বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় না, আর সর্বোপরি শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। আর শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্য আরও বেশি খারাপ হয়।

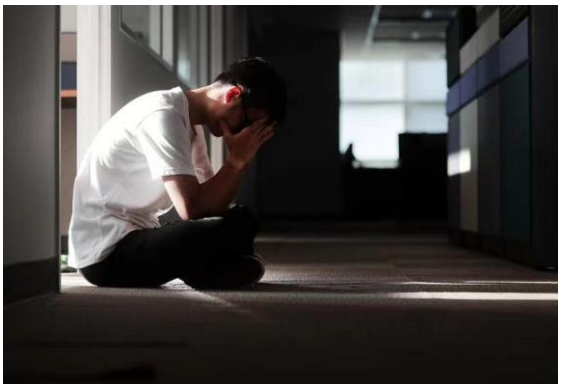

মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ থাকার পরও কিভাবে শারীরিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায়?

যেহেতু মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য একে অপরের পরিপূরক, তাই শারীরিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য তাগিদ দিলে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এর জন্য আমরা নিয়মিত ব্যায়াম করতে পারি, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে ব্যায়ামে অনীহা থাকে, আর সাধারণ কারনে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই ব্যায়াম করার

সময় আমাদের চারটি দিক খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতে হবে, সংক্ষেপে বলা হয় "FITT", তা হলো : ১। কখন কোনো ব্যায়াম করা হচ্ছে? বা Frequency ২। কোনো ব্যায়াম কি মাত্রায় করা হচ্ছে? বা Intensity ৩। কতটুকু সময় কোনো ব্যায়ামের করা হচ্ছে বা কী পরিমাণ বিশ্রাম নেয়া হচ্ছে? বা Time ৪। কী ধরনের ব্যায়াম নির্বাচন করা হচ্ছে? বা Type. তাই ব্যায়াম নির্বাচন করার আগে নিজের শারীরিক সমস্যা বা সক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করতে হবে, কোনো ব্যায়াম নতুন রোগের জন্ম দিতে পারে, তাই প্রাথমিক পর্যায়েই একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক এর পরামর্শ নেয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াম সবসময় সঠিকভাবে বুঝে করা, আর তার জন্য পরামর্শ সাপেক্ষে খুব প্রচলিত কিছু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও ব্যাবহার করা যেতে পারে, যেমন- Home workout, Fitify ইত্যাদি। তাছাড়াও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, ধূমপান বা মাদক গ্রহণ না করা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, শারীরিক রোগ থাকলে তার জন্য দ্রুত চিকিৎসা করা ও নিয়মিত ঔষধ সেবন করা, সকল কাজে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা।

আচ্ছা, আমাদের যদি শারীরিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হয়, তাহলে কী চুপচাপ বসে থাকি? গুরুত্ব না দিয়ে অন্যান্য কাজ চালাতে থাকি? যদি আপনার উত্তর ও 'না' হয়, তাহলে, মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে অবশ্যই মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ নিতে হবে। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে একমত হয়েই বলতে হবে, "There is no health without mental health".

ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান
পি.টি., শান্ডং বিশ্ববিদ্যালয়, চীন

দি অ্যাডভেঞ্চার ওফ টু হুইলস

"একটি চা-পাতা আর একটা সুজির প্যাকেট!"

এখন শ্রাবণ মাস; বালিতে মুড়ি ভাজার মত ফুটফাট সারাক্ষণ লেগেই আছে। তবে বৃষ্টি না হলে এতক্ষণ অন্য গান গাইতে শুরু করত খদ্দেররা। তখন মুড়ি, বাতাসা, আলু, পেঁয়াজ সবই চলত। একটা ছোকরা গোছের ছেলে; মাথায় ছাতা। তাকেই চা-পাতা দিচ্ছে সাম্য। পরনে ব্লু গেঞ্জি, হাফ হাতা শার্ট এবং থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট। চুল সযত্নে ছাঁটা, চোখে বড় ফ্রেমের চশমা। বাঁ হাতটা খালি-খালি লাগে, তাই সেখানে একটা স্মার্ট ওয়াচ। এটা নিত্যদিনের সঙ্গী। একটা ব্যাগে করে চা-পাতা দিয়ে বলল, তোমার হলো একশ সত্তর টাকা। ছেলেটি টাকা দিয়ে এবং জিনিস নিয়ে চলে গেল।

দোকান লাগোয়া ঘর। ঘরের আয়তন দোকানের চেয়ে খানিক ছোটো হলেও সেখানে তালপাতার সেপাই-এর মত সাম্য এর দেহটা আর সদ্য তেলে ভাজা ন্যুজ বেগুনির মত ওর ঠাকুমার শরীর দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। দরজার কাছে আয়তাকার একটা ক্ষেত্র। তার ওপর রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা করা আছে। একটা লম্বা বিছানার ওপর আরেকটা বিছানা। মজবুত কাঠের তৈরি। তবুও সাম্যের ঠাম্মা নিচে শোনো। এ ঘরের প্ল্যান নাতির নিজের করা। ঠাম্মার এখন বয়েস হয়েছে। তাই, সাম্য একা ছেড়ে যেতে ভয় পায়। দোকান বন্ধ করে ন'টা নাগাদ। রান্না দুপুরের আছে; গরম করে খাওয়া হবে।

বাবা-মা গত হওয়ার পর পরই সাম্য এসব কাজে পটু হয়েছে। গেন্ডারিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে ওদের দোকান। বিক্রি বাটা ভালোই হয়। তাছাড়া সাম্য ছাত্র পড়ায়। এইভাবেই বছর ছাব্বিশেক চলল। রুটি আর তরকারির বাটি

ঠাম্মাকে এগিয়ে দিয়ে নিজেও খেতে বসল। "তোমার যা লক্ষ্য, সেদিকে কেন যাচ্ছ না বাবা তুমি?" ঠাম্মার নিত্যদিনের এই বুলি শোনা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে! ও তবু খাবারেই মনোযোগী হয়। "ইদানীং তুই খুব অবাধ্য হয়েছিস সমু!" চায়ের সর জড়ানো ভঙ্গীতে ঠাম্মা স্বাচ্ছন্দ্যে বলেন। "সাম্য' উচ্চারণ করতে পারেন না, তাই ' সমু '।

"আমি এখন বড় হয়েছি। ভালো মন্দ বোঝার বয়েস হয়েছে। সাইকেল নিয়ে টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে চলবে কেমন করে ... ভাবছি পিএইচডি করে কলেজে চাকরির চেষ্টা করব। আর তুমি কিনা...!"

"সে তুমি ঘুরে এসে পাঁচটা বছর পরেও করতে পারো। পারো না? তোমার দাদু ও বাবা বড়ই একগুঁয়ে ছিলেন।" ঠাম্মা, নিজের পাতের একটা রুটি তুলে রেখে পান সাজতে বসলেন। কটাকট সুপুরির শব্দের সাথে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে।

ওদের পাশের ঘরটা বাথরুম। সেখানেই স্নান, প্রাতঃকৃত্য সারা হয়। সেই দেওয়ালের গায়ে মাথা ঝুঁকিয়ে, পালতোলা নৌকার মত উন্মুক্ত গগনে চেয়ে আছে বর্ষীয়ান সাইকেল। শ্রাবণের নিয়মিত ধারায় দুই চাকার আর সিটের অকাল বোধন হয়েছে। টায়ারের কাছে মাথা চারা দিয়েছে দুটো অকালপক্ক ব্যাঙের ছাতা! সেদিকেই তাকিয়ে রইল সাম্য পরিস্থিতির চাপে ওর আর দাদুর-সাইকেলের একই অবস্থা! উন্নত মস্তকে স্বাধীন হয়ে দাঁড়াতেই পারে না! আশপাশের সমাজ বড়ই গতিহীন! খুব কম মানুষই আছেন যারা এই জগত-সংসার ঘুরে দেখার বাসনা রাখে। এমন এক মানুষ ছিলেন সাম্যের ঠাকুরদা। বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি না — ওঁনার সম্বল কেবল এই সাইকেল। বলতেন, বাংলা সাইকেল। ঠাম্মার বিশ্বাস, নাতিও দাদুর মতই এই সংসার, দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখতে চায়। কিন্তু নিজের ভগ্ন শরীর তাতে প্রতিবন্ধকতার সামিল!

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে প্রত্যেক দিনের মতই ঠাম্মা উঠে পড়েছেন। মাজন হাতে ও বাইরে আসে। দেখে, ঠাম্মা সাইকেলের সামনে কুঁজো হয়ে বসে কি করছেন! শ্বেতশুভ্র আঁচল। মাটিতে লুটিয়ে আছে। "আবার কি করছো তুমি?" খানিকটা বিরক্ত হয়েই প্রশ্নটা করে সাম্য। ঠাম্মা না ঘুরেই বলেন, "তোর সাইকেলের চাকার কি অবস্থা!! রিয়াদের দোকানে নিয়ে যা। ও নতুন করে দেবে!"

সাইকেলের সামনে আসতেই সাম্যের মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে। কি সর্বনাশ! লোক দেখলে হুলস্থূল কাণ্ড বেঁধে যাবে। ডাল, ময়দা এমনকি কালকেই যে হাতা দিয়ে চা-পাতা কাটানো হয়েছে, সেই হাতার পেছন দিয়ে ঠাম্মা চাকা পরিষ্কার করছে! সাম্য হাতা কেড়ে নেয় এবং দোকানের দিকে রওনা হয়। আন্দাজ সাড়ে বারোটার সময় এসে দেখে ঠাম্মা মেঝেতে শুয়ে কি সব বিড়বিড় করছে, "তুই যা... তোর লক্ষ্যে..আমায় নিয়ে ভাবিস নে...তুই যা!" তালপাতার পাখা সরিয়ে ঠাম্মার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নেয়। গেলাসের জল মুখে দেয়। কিছুই হয়নি। ঠাম্মা ঘুমের ঘোরে ভুল বকছে।

বিকেলের মধ্যেই দুই চাকা নিজ ছন্দে সেজে ওঠে। একটা টিনের পাতলা স্তর কেটে ফেব্রিক রঙ দিয়ে লিখল, "ওয়ার্ল্ড ট্যুর"। তার নিচে ওর নাম, "সাম্য দাস"। ঠাম্মার কথায় বিকেলে পাড়ার কালীমন্দির গিয়ে সাইকেলের পুজো দিয়ে আসল। ঠাম্মা, ওর ডান হাতে বিপদতারিণীর সুতো বেঁধে দিল। সাইকেল নিয়ে বিশ্ব-ভ্রমণ—শুনতে অবাক লাগলেও অসম্ভব কিন্তু নয়!

কোথায়... কখন... কিভাবে, এসবের উত্তর দেয় একমাত্র যাত্রাপথ। এমনকি অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এসবের

জন্য আগে-ভাগে চিন্তা করাও বৃথা। "সব ঠিক হয়ে যাবে।" ঠাম্মার শেষ কথাটাই ওর শক্তি, প্রেরণা।

আজ প্রায় এক সপ্তাহ ঘর ছেড়েছে সাম্য। মাসতুতো ভাই ঋজুকে, দোকানের পাঠ বুঝিয়ে এসেছে। ঠাম্মাকেও ও-ই দেখবে। তবুও মনটা কেমন করে! বুড়ো মানুষটার কথা বড্ড মনে পড়ে। দাদু, বাবা আর মায়ের একটা করে ছবি থাকলেও এই অভিযানে দাদুর কথাই বেশি মনে পড়ছে। আর যেহেতু এদের মাঝে জীবিত একমাত্র ঠাম্মা, তাই তাঁর স্নেহময় হাতের ছোঁয়া সর্বদাই অনুভব করে সাম্য। সড়কপথ, নুড়ি-কাঁকর, কাদামাটি পেরিয়ে সাম্য এখন এক বিচ্ছিন্ন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। নিজের রাকসাক থেকে চা- পাতার কৌটো বের করে, ছোট্ট ষ্টোভে জল চাপায়; ফুটলে, তাতে পাতার গুড়ো দেয়। আজকে আপাতত এখানেই তাঁবু খাটিয়ে থাকবে। পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়েছে। সাম্য একবার ধ্যানে বসে। এই সময় মনকে শান্ত রাখা অত্যন্ত জরুরী। কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মানসিক দৃঢ়তাই তখন শেষ কথা। তাই সাথে এনেছে পকেট কোরান, বাইবেল আর শ্রীমদভগবদগীতা।

সাম্য অভিযানে প্রথম অন্তরায় দেখা দিল বর্ডার ক্রস করার পর। ছমছমে বৃষ্টি শুরু হল। নিজের পরিচয় পত্র এবং যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া স্বত্বেও জেনারেল ওকে সাময়িক একটা ঘরে বন্দী করে রাখেন। যদিও মিনিট দশেক পর সমস্ত বাঁধা কেটে যায়। বাহাদুর ইসলাম নামে একজনের কাছে আদা-রসুন আর পেঁয়াজ দেওয়া আলুর চপ খায়। ষাটোর্ধ্ব এই বুড়োর চপ নাকি ভারতীয় ট্রাক বাসিন্দাদের কাছে খুব প্রিয়। তাদের কাছে চপ পিছু তিন টাকা বেশি নেন। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। সাম্য কেল দোকানের একপাশে খাটিয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি, নিজে ফিরে যান গ্রামে। বুড়ো আর তাঁর নাতনী থাকে সেখানে।

বৃষ্টি একসময় থেমে আসে। আকাশে মেঘেদের হুটোপুটি লেগে যায়। দূরে হাতে গোনা নক্ষত্ররা টিমটিম করছে। আচ্ছা, চাঁদের পাহাড়ে শংকর কিংবা লিভিংস্টোন যখন একটার পর একটা অভিযান করছেন, তখনো কি তাদের এমন পরিস্থিতি এসেছে!! যে কদিন ঘরছাড়া হয়েছে, একটাও দিন না খেয়ে তো কাটায়নি। খাবারের সাথে-সাথে এই দু'চাকার ভবঘুরেকে পানীয় পেতেও অসুবিধে হয় নি। বাংলাদেশ তেতুলিয়া বর্ডার ক্যাম্প থেকে কিছু খাবার ওকে দেবে বলেছিল। দাদুর মুখে এই শস্য-শ্যামলা দেশের কথা অনেক শুনেছে। আজ চাক্ষুষ করল। ওই দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা!। ওখানে কিছু লোকাল হাট আছে হাটে টাটকা সবজি বিক্রি হচ্ছে। একটা অডিটোরিয়ামে শহিদ দিবস স্মরণে উদযাপন করা হয়েছে। যে রুট ধরে সাম্য এগিয়ে চলেছে সেখানে একটা পাহাড়ি গ্রাম পড়ে। আছে ঝরনা। ভাঁড়ে চা নিয়ে ঝরনার শোভা উপভোগ ইতিপূর্বে ও করেনি। তিমির অরণ্য থেকে শান্ত জলধারা যেন অমৃতবাণী! দুটি প্রতিবেশী দেশের অমিল হাতে গোনা। এখানে, বাংলা ভাষার সাথে মাটির একটা নিবিড় যোগাযোগ বর্ডার পার হয়ে বড় ডাঙ্গা পাড়া পৌঁছে তাই, বিদেশে এসেছে বলে এতটুকুও মনে হচ্ছে না সাম্যের।

ইতিমধ্যে চাকায় বেশ কাদা জমেছে। হঠাৎ চাকায় হাত দিতে সেটা কেমন বেঁকে গেল। সাম্য দেখল, বৃত্তাকার চাকার কিছুটা জড়িয়ে আছে একটা সাপ! যাত্রাপথে একজন বলে গেলেন, "ওটা শঙ্খচুড়া!"

চাকায় কুণ্ডলী পাকানো সাপটার ছবি তুলল। অবশ্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীটি আপনা হতেই সরে পড়ল এবং সাম্য আবার এগিয়ে চলল। ভোরবেলায় সাইকেল রওনা হয়। মাঝে রেস্ট দু'বার। দুপুর আড়াইটে-কি তিনটের মধ্যে বিশ্রাম। সেক্ষেত্রে পথ দুর্গম হলে আরও আগেই বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে।

মহানন্দা নদী পেরিয়ে তবেই শিলিগুড়ি ঢোকা সম্ভব। নদীপথে নৌকাই আশা ভরসা। পাটাতনের সাথে সাইকেল বেঁধে দিব্যি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা গেল। এরই মাঝে ঋজু আর ঠাম্মার সাথে কথা হয়। ঠাম্মাকে অনেকটাই সুস্থ মনে হল। হয়তো সাম্যের অভিযানের কথা শুনে বৃদ্ধা চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন।

শিলিগুড়ি পার হয়ে সাম্য সিকিম যায় ওখান কর সংস্কৃতি মানুষ দেখে সাম্যের খুব আনন্দ হয় সিকিম থেকে আসাম পরে নাগাল্যান্ডে গিয়ে সাম্য দোচালায় ভোগে। এখানে খাবার আছে, পানীয় আছে তথাপি ওকে ভাবতে হচ্ছে। এখানকার এক গাইডের সাথে ওর পরিচয় ছিল। ওর নাম মাভি। আর তার পোষ্য, ডুকো।

"ইধার, সবই পে যাবেন। কুচ পর্বা নেহি।" সাথে-সাথেই একটা শিস দিয়ে ডুকোকে ডেকে নিল। ভেঁড়ার মত লোমশ কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে আসল। একবার সাম্যের সাইকেলে গন্ধ শুকেই চলতে আরম্ভ করল। সাম্য ভাবছিল একটু শাক, সবজি, আর মাংস নিলে ভালো হত। শরীরটা দুর্বল ঠেকছে। মশলাপাতি সাথে আছেই। মাভি দর-দাম করছে দেখে সাম্য বলল, "তুমি কি করছো মাভি!! আমি তো এসব মুখেই দিতে পারব না!"

একজন মাঝবয়েসী মহিলা কয়েকটি পলিথিনের পাত্রে গুটিকয়েক ব্যাং নিয়ে বিক্রি করছেন। চার-পাঁচটা ব্যাং একসাথে সুতো দিয়ে বাঁধা। এক-একটা জোটের মূল্য একশো টাকা। এছাড়াও শুঁয়োপোকার মত দেখতে পোকা বিক্রি হচ্ছে। তারই পাশে খরগোশ, শ্বেতকায় ইঁদুর আছে। একটা সময় সাম্যের মনে হল, ও বাজারে নয়; বরং হরেক পশুপাখির খাঁচায় সমৃদ্ধ চিড়িয়াখানায় এসেছে! হাঁটতে-হাঁটতে বাজার শেষ হলেও খাওয়া কিছুই হল না। বছর পঁচিশের প্রাণবন্ত মাভি শেষে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলল, "আপ, ইয়ে খা লিজিয়ে। গ্র্যানি কো মত বাতানা!"

মাথায় ওড়না জড়ানো, টানা চোখ দুটো প্রায় বন্ধ মনে হল এবং এলোকেশী। অপূর্ব এই। সুন্দরী উঠপাখির্ম মাংস দিয়ে তৈরি সসেজ রোল বিক্রি করছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাম্য খেল। বেশ মাংসের মত খেতে, ভেতরে সবজি দেওয়া। তেলে ভাজা দুটো সসেজ থেতেই খিদেটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠল।

তুলো ভর্তি বালিশের মত মালভূমি, উপত্যকা বেয়ে মাথা-চারা দেয়া গাছের সারি, থেকে-থেকে আড়ি পেতে শুনতে আসা মেঘের দল সাম্যকে হাতছানি দেয়। মাভিকে ও ইংরাজী হিন্দি মিশিয়ে বলে, "মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তাকে বাঁচানোটা আমাদের কর্তব্য। এটাই ওর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।"

মাভি কি বুঝল তা বলা মুশকিল! তবে পাহাড়ের ধাপ কেটে ওরা যেখানে পৌঁছাল সেটা উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম। লঙ্গা পরিবারের কর্তা হলেন আশি বছরের বেনথাও। হাড়গিলে কলেবরটি যেন পাথর কেটে নির্মাণ করা হয়েছে। গলার মালা জঠরদেশ পর্যন্ত আবৃত। তাতে বন্য শূকর আর হিংস্র বাঘের দাঁত ঝুলছে। কটিদেশে তিনটে কঙ্কাল মুণ্ড এবং তার গায়ে অজস্র কেশরাশি। অর্থাৎ সর্দার একসময় তিন-তিনজনকে হত্যা করেছিলেন। আসাম থেকে চা, ভাতের চাল, নুন নিয়ে আসা হয়। যাত্রা পথে অপহরণ, এমনকি লুণ্ঠন পর্যন্ত হতে পারে। আসলে এরা সরকারি কোনও সহায়তা ছাড়াই দিন যাপন করেন। এক কথায় দুর্গম পরিবেশে অতি নিকৃষ্ট মানের জীবনযাত্রা।

সকালে রওনা দেবার আগে উপজাতি রমণীরা চালগুঁড়ির পিঠে, কেক, নাগাদের অস্ত্র 'দা' দিয়ে কাটা মুর্গীর মাংস ইত্যাদির আয়োজন করেছে। সাম্যের মনে হল শরীরে বেশ অনেক দিন পর বল এল। এরপর, শিশু এবং বয়স্কদের সাথে সখ্যতা বিনিময় করে রওনা দিল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতেই মাভি বলল,

"দোস্ত, আলবিদা। হামারি সাফার খতম হুয়া! " সাম্য, ডুকো আর মাভিকে বিদায় দিয়ে নিজের অন্তিম লক্ষ্যের দিকে এগোতে থাকল।

অক্টোবরের শেষে সাম্য ব্রহ্মপুত্র নদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এরপরের যাত্রা সামচুং জঙ্ঘা বর্ডার হয়ে ভুটান, নেপাল এবং সবশেষে খার্দুংলা পাস! উচ্চতা প্রায় সাড়ে সতেরো হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু এখনই চোখে সরষে ফুল দেখছে সাম্য। পায়ের পেশি কেঁপে- কেঁপে উঠছে। সাইকেলের কলকব্জা ঢিলে বোধ হচ্ছে! কলকলিয়ে নদী বয়ে চলেছে। একটা পাথরে সাম্য হেলান দিয়ে বসে পড়ে। বছরের এই সময়ে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এখানে শীতের আগমন হয়। দুটো সোয়েটার, একটা জ্যাকেট গায়েও সাম্য থরথরিয়ে কাঁপছে। ক্ষণিকের জন্যে শুধু একবার দেখল দূরে এক স্নেহময়ী রমণী বসে আছেন। কানে ভেসে আসছে মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্র!

ঢাকা তে শেষ দুর্গাপুজো। মা আর ঠাম্মা, ঠাম্মা দাদুর হাত ধরে। সাম্য দৃঢ়ভাবে ওর মাকে ধরে আছে। ধীরে-ধীরে সেই হাত আলগা হচ্ছে। ঘন কুয়াশার আড়ালে ঢেকে গেল একফালি সাদা আঁচল!

"ইয়ে লেরকা আকেলা ঘুমনে কে লিয়ে আয়া হ্যায়! জরুর বাঙ্গালি হোগা! ইয়ে বাবু! উঠ যা..." মাথার ওপর সূর্য স্থির হয়ে আছে। সাম্য চোখ খুলেই একটু অস্বস্তিতে পড়ল। ওর সারা শরীর নগ্ন! এমনকি কটিদেশের নিচেটাও! ওকে কেন্দ্র করে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের এক কথায় সাধু-সন্ত বলা যায়। সাম্য, পাশেই পড়ে থাকা চাদরটা নিজ সম্মান রক্ষার্থে গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর স্বাভাবিক ছন্দে বলল, "আমি কোথায়? আমার সাইকেল?"

গাঁজা সেবন করে এক সাধুবাবা বললেন, "তুমি বাঙালি! স্বর্গে গিয়েও ঢেকি ধান ভাঙে! আর মৃত্যুপথে তুমিও সাইকেল খুঁজছ?"

সাধুদের মাথা-মুখ যেন আমাজনের জঙ্গল! কি বীভৎস সেই চেহারা! প্রথমে ওঁরা কারনসুধা দিলেও সাম্য সন্তুষ্ট হয়। একটু স্থিরতা এলে সাধুবাবা বললেন, "তোমার আজ তিনদিন পর জ্ঞান ফিরল। তারপর, একটা ছোট্ট শিশি দেখিয়ে বললেন, এই অমৃত দিয়ে তোমার শরীরটা যদি দলাই-মালাই না করতাম, তাহলে তোমার নামে 'বোম-শংকর' আওরাতে হত।"

রাতদিন মারিজুয়ানা বা গঞ্জিকার কিরকিরে গন্ধে আর বোম-শঙ্করের চোটে সাম্য ভাবল, এখান দিয়ে কেটে পড়াই শ্রেয়। এদিকে সেলফোনটা দেহ রেখেছে। দিক নির্ণয়ে অসুবিধে হচ্ছে। আসার সময় কতগুলো বাইক আরোহীর সন্ধান পেয়েছিল। এখন হয়তো তারাও অনেকটা এগিয়ে গেছে। শেষে ৮ম দিনের মাথায় সাম্য ওর দুই চাকার ঘোড়াকে পথে নামাল। সাধুবাবা কুটির থেকে বেরিয়ে বললেন, "তেরা ভালা হোগা। পিছে মুড়কর কভি মাত দেখনা। বোম শংকর..."

পাহাড়ের ঢাল পেরিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে সাম্য। কি মন গেল পিছনে ঘুরে দেখল একবার। মনে হল প্রকৃতির কোলে বাস্তব- অবাস্তব সবকিছুই মিলে-মিশে থাকে। দূরে পাহাড়ের ঢালু জমিতে সাধুবাবাদের কুটীর এখন পুরোটাই অদৃশ্য!

সামচুংজঙ্ঘা দিয়ে ভুটানে ঢুকতে বৃষ্টি এল। একটা উঁচু টিলার ওপর উঠে দু'হাত দুদিকে মেলে দিয়ে আসমানি মেঘেদের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাম্য নবজন্ম লাভ করা সাইকেল যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া! ইতিমধ্যে শকটে লাল, হলদে, সবুজে তিব্বতীয় ভাষার ধ্বজা অঙ্কিত হয়েছে।

দুর্গম পঙ্কিল যাত্রার সবটাই ডকিউম্যানটেশনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সাম্য সাইকেল নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। স্থানীয়দের সাথে-সাথে উপজাতিরাও

স্টল দিয়েছে। বিভিন্ন রকমের মালা, পশুর চামড়ার তৈরি শাল, বাইসনের শিং-এর চামচ, চিরুনি বিক্রি হচ্ছে। হঠাৎ পিঠে একটা টোকায় সাম্যঘুরে দেখল, জুকোমা এসে পড়েছে। সাথে ওর রেঞ্জার-সাইকেলটা সহাস্যে প্রজ্জ্বলিত।

জুকোমা ভুটানি তরুণী। সাম্যের সমবয়সী বলা যায়। সাম্যের শীর্ণ দশা দেখে একটা আলখাল্লার মত পোশাক দিল। হাতার কাছে সাদা গোল- ডিজাইন করা। গলায় পশমের মোটা চাদর। গলায় পটলের সাইজের টুকরো দেয়া হার। জুকোমার চুল কাঁধ ছুঁয়েছে, জামার বড় হাতা আর কটিদেশের বিশাল ঘেরওলা পাটের কাপড়। ফলে হাত আর পা ঢাকা।

ধ্রুপদী গানের আসর জমেছে। সূর্যাস্তের সাথে ভুটানিদের হাত-জড়ো করে নাচ, বাদ্যযন্ত্র যেটা ছোটো সেতারের মত দেখতে, তার মাতাল করা সুর—সব মিলিয়ে অভূতপূর্ব! সাম্যের মনে হল, পীতবর্ণ আকাশ হতে দৈব আশীর্বাদ ভেসে আসছে। ভিড়ের মধ্য সবাই কিছু-না কিছু কলাকৌশল দেখাচ্ছে। জুকোমা কিছুটা ইচ্ছে করেই ঠেলে ওকে মাঝখানে পাঠিয়ে দিল। বলল, "ও টিচার আছো!"

সাম্য খানিক ভেবেই, জুতো খুলে নিজের জিমন্যাসটি দেখাল। হাত দুটো মাটিতে রেখে সমগ্র শরীরটা শূন্যে ভাসিয়ে দিল। বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল সবার তালি আর হুল্লোড়ের শব্দে।

এত রকমের খাবার সাম্য কখনো খায় নি। ইয়াকের দুধ দিয়ে তৈরি মাখন, ঘি, শূকরের কোপ্তা, বাম্বু শুটের রেসিপি, গম দিয়ে বানানো লম্বা সাপের মত নুডলস বার্লি, সয়াবিন, শুকনো মেদবিশিষ্ট শূকরের মাংস এবং চাটনি। যে ক'দিন ও জুকোমার সাথে ঘুরেছে তাতে এটা বুঝেছে, মেয়েটা স্বাধীনচেতা। অনুসন্ধানী চোখ আছে। ওকে এখনো স্থায়ী চাকরি করার জন্যে জোর করা হয়। সাম্যের মতই জুকোমার বাবা নেই। পথ দুর্ঘটনায় মারা যান দশ বছর আগে। সেই থেকেই সাইকেল নিয়ে ওর বিচরণ শুরু। কথা বলতে-বলতে পাতা ভিজে আসে জুকোমার। নুড়ি পাথরের মাঝে বিলি কেটে বলে, "তুমি কালই রওনা দেবে!"

কথার ভাঁজ এড়িয়ে সাম্য বলে, "এ যাত্রায় আমার একমাত্র সঙ্গী এই সাইকেল! যতদিন ও আছে, ততদিন এই সাম্যের বিশ্ব অভিযান বেঁচে থাকবে। উত্তরে রীতিমতো বরফ পড়া আরম্ভ হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি যাব, ততই মঙ্গল।"

ভুটানি তরুণী জুকোমা আর সদ্য রেগে যাওয়া বাঙালি তরুণীর মধ্যে কোনও তফাৎ খুঁজে পাওয়া গেল না। হাত দুটো বুকের কাছে সমান্তরাল রেখে অন্যদিকে চেয়ে রইল। "রয়্যাল ভুটান পুলিশের পক্ষ থেকে একটা মেডেল সাম্য কে প্রদান করা হয়। ওর পাসপোর্টে আরেকটি দেশের সম্মান নামাঙ্কিত হয়। ভোর রাতে উচ্ছ্বসিত জনতা আর জুকোমা একরাশ প্রেরণা দেয় ওকে। জুকোমা, নীল নেল-পলিশ মাখা আঙুল দেখিয়ে বলল, "স্যাক্রিফাইস টুডে ফর ইওর বেটার টুমরো..."

নেপালের অন্তর্ভুক্ত বাজুরা নামক স্থানে সাম্য বিশ্রাম নেয়। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। কাছেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা চালাঘর আছে। তার নিচে ও তাঁবু খাটায়। দপদপিয়ে জ্বলা অগ্নিশিখার সম্মুখে কফি হাতে কত কি মনে পড়ছে। সাম্যের রাকসাকটা বিভিন্ন দেশ-বিদেশ, রাজ্যের তকমায় ভরে গেছে। নাগাল্যান্ড থেকে এমব্রয়ডারির শাল, ঋজুর জন্যে টুপি আছে। ও চেখে দেখেছে ইয়াকের দুধের তৈরি মাখন, ঘি, চা। ভাষা জেনেছে দশেরও বেশি; যেমন- মণিপুরী ভাষা, গারো ভাষা-ভাষীদের সাথে কোমর দুলিয়ে নাচা, এছাড়াও নেপালি, লেপচা, গুরুং, লিম্বু, বোরো ভাষার রীতিনীতি প্রত্যক্ষ করেছে। প্রায় আট হাজার কিমি

দূরত্বের এই অভিযানে সংগৃহীত বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রেরণা, তাঁদের দস্তখৎ, অনুপ্রেরণা বাণী, পদক ইত্যাদি অন্যতম প্রাপ্তি। নেপাল, ভুটান, সিকিমে এসে একটা জিনিস দেখেছে, এরা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে। নেপালে তামাক নিষিদ্ধ। আবার যেখানে-সেখানে প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি ব্যবহার বা ফেলা আইনত অপরাধ।

মাতৃভূমিকে এরা খুবই শ্রদ্ধা করে। সাম্য জানতে পারল, এদের বার্ষিক আয়ের অধিকাংশই আসে পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে। তাই উন্নত রাস্তাঘাট, থাকার ব্যবস্থা এবং নিয়ম শৃঙ্খলা। ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন রাস্তাঘাট, থাকার জায়গা এবং ঘোরার জায়গার সাথে এদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য আছে। তথাপি বাংলাদেশী হিসাবে সাম্য কে যথেষ্ট সম্মান এরা যে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন মন্দির, বৌদ্ধ স্তূপ, খৃষ্টান মিশনারি, জৈন মন্দির, দরগা, উপজাতিদের দেবদেবী, বনদেবী, ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণের একটাই উদ্দেশ্য –সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সবশেষে, প্রকৃতিকে ভালোবাসা, নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস এবং জন্তু জানোয়ারদের হত্যা না করা, পশুচর্মের লেনদেন বন্ধ করা ইত্যাদির বার্তা দিয়েছে। আর এই দুর্গম যাত্রাপথে আশীর্বাদ হিসাবে পেয়েছে ওর ঠাকুমাকে, মা দুর্গাকে আর পাহাড়ের অতীন্দ্রিয়বাদী সাধু-সন্তদের অবিরাম সেবা, যা ওকে পুনরায় নিজ শিরদাঁড়ায় দৃঢ় হতে প্রেরণা দিচ্ছে। সাম্যের কাছে 'একসপিডিশ্যান' হল মূল মন্ত্র। সাইকেল কাঁধে নিয়ে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী পেরোনো, সাপের কামড়, ঠাম্মার বারণ স্বত্বেও শূকরের মাংস খাওয়া, হাসিমারায় জোঁকের কবলে পড়া, ঘণ্টার-পর ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা, হাড় কাঁপানো শীত আর বৃষ্টিতে হরিনাম জপ করা—সবার জন্য একটাই মন্ত্র—

"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে,
দেখব এবার জগৎটাকে...
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে?"

পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সাম্য খার্দুংলা পাস-এ পৌঁছায়। ট্রান্স হিমালয়ান এই রুট আর সার্ক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি অতিক্রম করতে প্রায় আট মাস সময় লেগে গেল। উঁচুতে ওঠার পূর্বে ও খাওয়া-দাওয়া করে। খাবার বলতে আলু-পরোটা, আচার আর দই। সেলফোনটায় চার্জ দিতেই জীবিত হয়। আতো-আতো ভাষায় ঠাম্মা বলেন, "কেমন আছু? আমায় চিনতে পারতো!" তারপর সাম্যের মুখ দেখে বললেন, "এত রোগা হয়ে গেছু! সাবধানে আসিস বাবা।"

ঋজু বলল, "সাম্য দা, তুমি যাওয়ার তিন মাস পরেই সাংবাদিকদের ভিড় জমে। ওরা ঠাম্মার ইনটারভিউ নিয়েছে।"

ইতিপূর্বে সাইকেল নিয়ে এই পথ কেউ অতিক্রম করেছে বলে সাম্য শোনেনি। তাছাড়া এ বড়ই দুর্গম অঞ্চল। অনেক জায়গায় বাসের মাথায় সাইকেল চাপিয়ে ও দিব্যি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এসেছে। সেক্ষেত্রে, বাসের মাথায় চেপে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও অসামান্য। নিজের ব্যাগ থেকে সাম্য লাল সবুজ রঞ্জিত পতাকা বের করে। কিছু না পেয়ে পতাকাটা মাথায় বেঁধে নেয়। সাইকেল থাকে ওর গায়ে ঘেঁষে। খার্দুংলায় অনেকে এসেছেন। সব বাইক আরোহী। সাম্য কে দেখে তাদের আনন্দে আর গর্বে ছাতি প্রসারিত। কেউ-কেউ আবার ওর সাথে ছবিও তুলল। বলল, "সাম্য দাস, ইউ আর এমেইজিং।"

ভারি মেঘেদের কাছে নতি স্বীকার করেছে বিশাল পাহাড়। সহস্র বছর ধরে বিরাজমান এই শ্বেতশুভ্র মহাদানবেরা সাম্যের চোখের ঘুম কেড়েছে! সাথে তুষার বৃষ্টি। হাতের মুঠোয় তাল-তাল বরফ নিলে

হাড় কনকন করে। এখানে প্রকৃতি একাই বিরাজমান। এত ওপরে ওঠার জন্য রাস্তাটাও মানুষ ঠিকমতো মেরামত করতে পারেনি। এত উঁচুতে সভ্যতা আদতে শূন্যতা লাভ করেছে। দুর্গম প্রকৃতি, তিমির অরণ্য আর খরস্রোতা নদীর মাঝে আমরা আজও কেবলই দর্শক।

ফেরার সময় ওর শরীর ভেঙে পড়ে। সম্প্রতি একটি সরকারি টিভি চ্যানেলে ওর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই সোলো এক্সপেডিশানের মোটো বা মূলমন্ত্র কি, তা জিজ্ঞাসা করলে ও বলে, "প্রথমে অভিযানই আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যাত্রাপথে এত মানুষ, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আমায় উদ্বুদ্ধ করে। তারা এভাবে পাশে না দাঁড়ালে বোধয় আমার অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হত না।"

পুনরায় খাবার প্রসঙ্গ উঠলে সাম্য সাবধানতা অবলম্বন করে। কারণ ঠাম্মা বাড়িতে এই লাইভ টেলিকাস্ট দেখছেন। অনেকেই সাম্য কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। একটি সংস্থা আবার ব্র্যান্ড এম্বাসেডর করার কথাও বলেছে। কিন্তু সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল, বিখ্যাত সাইক্যালিস্ট অমর কৃষ্ণানের চিঠি। যিনি, তাঁর পরবর্তী বিশ্ব-ভ্রমণের জন্য সাম্য কে আহ্বান জানিয়েছেন। একবার সাইকেলে হাত রেখে সাম্য ভাবল, অভিযান এখন নেশা; শেষ হয়েও হল না শেষ!

সীমান্ত দাস
বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং), অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং,
শেনইয়াং অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি

University Campus

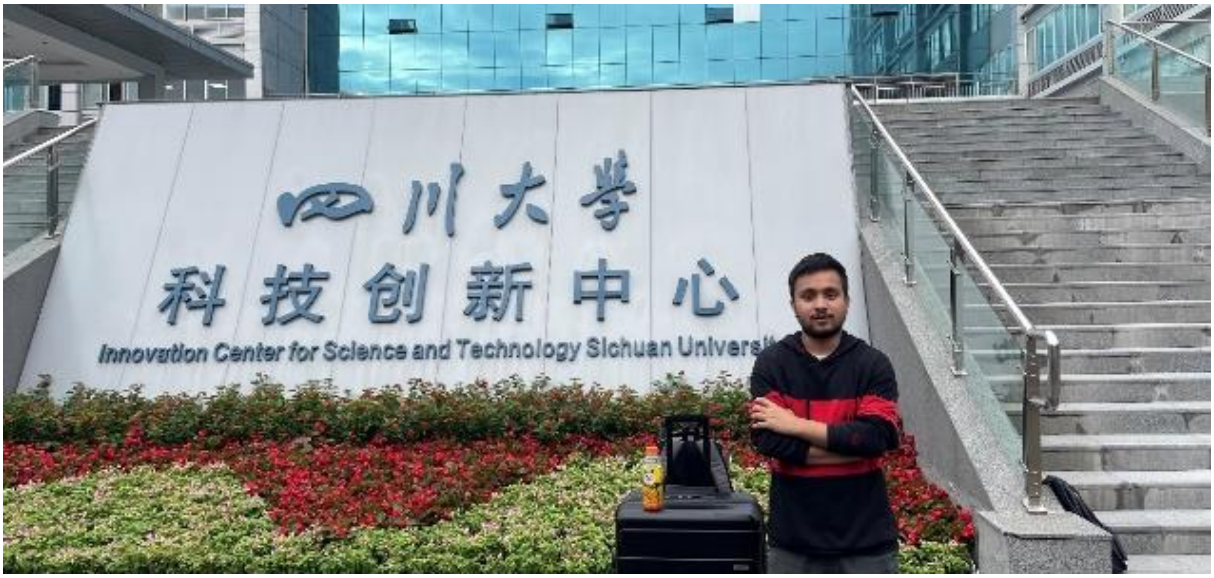

Sichuan University (SCU) is one of the most prestigious universities in China for its education, research, and social impact, ranking among the top 10 best national universities in China mainland. Sichuan University established in 1896 that combined traditional and modern methods

of education, SCU is located in Chengdu Sichuan University (SCU) is a national key public research university in Chengdu, Sichuan, China. The university is wholly funded by the Ministry of Education. Sichuan University is a good rank University in the world also. According to cwur.org the world rank of Sichuan University is 208. Sichuan University has two national key labs, six national engineering centers, five ministerial (MOE) key labs, 35 provincial key labs, 10 ministerial and provincial centers, four key research bases for humanities and social sciences, and four clinical research bases at the national level. The university has

invested significantly in research, teaching and medical equipment, with a total value of about 530 million RMB. Sichuan University's three campuses are located in Chengdu, the capital city of Sichuan Province. The older Wangjiang (望江) campus is in central Chengdu, adjacent to the Jinjiang River and its tributary the Jiang'an River. The nearby Huaxi (华西) campus is the site of the medical school. The Jiang'an (江安) campus was built in

2003 in Shuangliu County about 12.5 km away from the older campuses; it covers an area of about 4.7 km^2 and has total floorage of more than 2.7 million m^2. New attending students (most of them) will spend their first and second year in Jiang'an Campus (the newest campus) and then moving to Wangjiang campus for the rest of their college years. The university has over 30 colleges or schools in various disciplines.

Sichuan University has set up different types of scholarships to encourage and financially support excellent international student There are four kind of scholarship one is The Belt and Road scholarship, Chinese Government Scholarship, Confucious Institute Scholarship and Chengdu Government Sister-Cities Scholarship. Students who want to apply for the Chinese Government Scholarship can send them the application process above. Have them apply at www.csc.edu.cn as well as www.sculx.cn.

Muhammad Al Amin
Masters,
Sichuan University (四川大学).

সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার

আজ মহান বিজয় দিবস, বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য এবং বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিন। বীরের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের নাম জানান দেওয়ার দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সাল থেকে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চে গণহত্যা শুরু হলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লাখ শহীদ ও দুই লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। সেই হিসাবে বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তির দিন আজ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি পরাধীনতার শেকল ভেঙে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে। ২৪ বছরের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় এক নতুন সূর্যোদয়। প্রভাত সূর্যের রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সমস্বরে একটি ধ্বনি যেন নতুন বার্তা ছড়িয়ে দেয় 'জয়বাংলা' বাংলার জয়, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল।

মহামুক্তির আনন্দঘন এই দিনে এক নতুন উল্লাস জাতিকে প্রাণ সঞ্চার করে সজিবতা এনে দেয়। যুগ যুগ ধরে শোষিত বঞ্চিত বাঙালি চোখে আনন্দ অশ্রু আর ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যায় সামনে। বিন্দু বিন্দু স্বপ্নের অবশেষে মিলিত হয় জীবনের

মোহনায়। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের তাহার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। বাঙালি যেন খুঁজে পায় তার আপন সত্তাকে।

মুক্তিপাগল বাংলার দামাল ছেলেরা স্বাধীনতার রক্ত সূর্যকে ছিনিয়ে আনবে বলে একদিন অস্ত্র কাঁধে তুলে নেয়। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার সবাই শরিক হয়ে থাকে এ লড়াইয়ে। যতই দিন অতিবাহিত হতে থাকে আরও শাণিত হয় প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র। লক্ষ্য স্থির রেখে শত্রু হননে দৃঢ়তায় এগিয়ে যায় বীর বাঙালি। ইতোমধ্যেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রতিবেশী ভারতও জড়িয়ে পড়ে বাঙালির ভাগ্য যুদ্ধে। ডিসেম্বর শেষ পর্যায়ে এসে চূড়ান্ত রূপ নেয় এই যুদ্ধের।

অবশেষে নয় মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতির জীবনে এলো নতুন প্রভাত। ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হল মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য বিজয়। এর মধ্য দিয়ে এলো হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বাঙালি জাতি এদিন অর্জন করে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত আর দুই লাখ ধর্ষিতা মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনতা ধরা দেয় বাঙালির জীবনে।

বিজয়ের এই ৫১ বছরে বাংলাদেশের অর্জন নেহাত কম নয়। আজ পুরো বিশ্ব ছোট্ট এই বাংলাদেশকে চিনে। সমীহ করে বহুক্ষেত্রে। এদেশের মানুষ নিজেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে বারবার। স্বাধীনতার এই চেতনা ও বিজয়ের উদ্দীপনা বুকে নিয়ে বাঙালি ছুটে চলেছেব দিকবিদিক। শত সমস্যা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকলেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দূর থেকে বহুদূর। বিদেশি পড়ুয়া শিক্ষার্থী হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আবেগ আরো প্রবল আমাদের। নিজের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার এই সৌভাগ্যই জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। বাংলাদেশের জয় হোক। সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

মঈন উদ্দিন হেলালী তৌহিদ
মাস্টার্স শিক্ষার্থী,
চায়না ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম, বেইজিং।

বুড়োর ডায়েরি থেকে

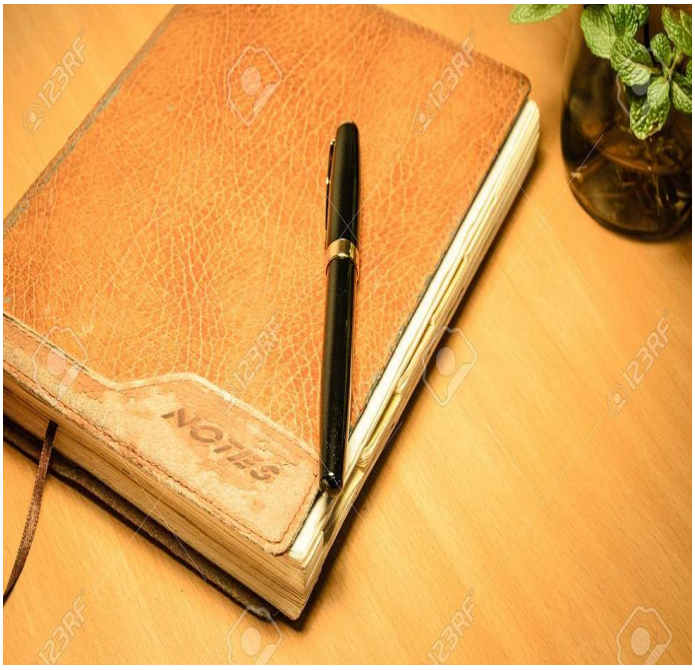

সেপ্টেম্বর ২০, ২০৭৯!

-দাদুন, মাম্মাম বলেছে ঔষুধ খেয়ে নিতে।

-আচ্ছা দাদুভাই।

ভাগ্য ভালো ছিল বলে দিন দুয়েক আগে হসপিটাল থেকে বাসায় এসেছি। না হলে ছেলেমেয়েরা আমাকে পুম্পের পাশে মাটিচাপা দিয়ে আসতে প্রায়ই প্রস্তুত! বিছানার পাশ থেকে লাঠিটা নিয়ে কোনো মতে বারান্দায় আসতেই চোখ পড়ল কফিনটার উপর। সুন্দর ছিমছাম নীল রঙের একটি কফিন। বর্ষাকাল বলে নাতনি অনলাইন থেকে অর্ডার করে রেখেছে আমার জন্য।

সেপ্টেম্বর ২৯, ২০৭৯!

রুমে এসে পুরনো ফটোগ্রাফ ঘেটে আমাদের ছবিটা পেলাম। মা-বাবার মাঝখানে আমি আর অনীল।

অবশ্য মায়ের কাছে ছোট্ট ছোট্ট বায়না ধরা সেদিনের অনীল ও এখন বেশ বুড়ো। গোঁফে পাক ধরেছে। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর অনীল আমেরিকা চলে যায়, সেখানে তার ছোট্ট সংসার নিয়ে বেশ খুশি। প্রায় বছর সতের হচ্ছে অনিলের সাথে বসে চা খাওয়া হয়নি। সাত-পাঁচ ভেবে তাকে ইমেইল পাঠিয়ে দিলাম কিন্তু এতো ব্যস্ততার মধ্যে তার কি ফেরা সম্ভব দেশে?

নভেম্বর ১৮, ২০৭৯

রেহনুমা রুম থেকে বের হতেই হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। দাদুনের সাথে বেশি সময় থাকলে ওর পড়াশুনার ক্ষতি হবে তাই এখন থেকে সপ্তাহে শুধুমাত্র একদিন আমার এই বাড়িতে আসা হবে। সাফাওয়াত এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেলো এই বয়সে বাগানবাড়িতে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি। যাইহোক ভালোই হলো আমি বাগানবাড়িতে থাকলে অন্তত ছেলের পকেটে কিছু সঞ্চয় হবে।

জানুয়ারি ০১, ২০৮০

পুরনো ডায়েরি ঘেটে আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড পেলাম। আইডিতে লগ ইন করে দেখি কয়েকশ মেসেজ। এরমধ্যে অনলাইনে সব মিলিয়ে ২৮ জন। মামুনের ইনবক্সে ঢুকতেই বেশ কয়েকটা মেসেজ দেখলাম।

"বন্ধু শরীরটা ভালো নেই, বেশিদিন হয়তো বাঁচবো না,তোদের অনেক মিস করি।"

খেয়াল করলাম মেসেজটি ঠিক বছর তিনেক আগের।শুভ বলেছিলো গত দুই বছর আগে ক্যান্সারে মামুন মারা যায়।

এককালে বন্ধুদের সাথে কতশত আড্ডা, মজার মজার চ্যাটিং সবকিছুই জীবন্ত।

পিংকিকে একটিভ দেখে ভিডিও কল দিতে রিসিভ করলো। হাসি থামাতে পারলাম না, এক সময়ে ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির সামনের পাঁচটা দাঁত নেই। কিছু বলার আগেই কেটে দিলো।মনে হলো রাগটা এখনো দিব্যি কমেনি।

জানুয়ারি ২৬, ২০৮০

আজ অনেকদিন পর তার কথা মনে পড়ছে। তবে ওর কোনো খবর জানিনা। চ্যাটলিস্টের একদম নিচের দিকে তার মেসেজ দেখলাম। হ্যাঁ আমার পুরনো অভিমানী ভালোবাসা। কত ভালোবাসতাম দুজন দুজনকে। বিয়েটা হয়নি তবে।

আইডিতে ঢুকতেই তার মেয়ে শেফার সাথে একটি ছবি। বাহ্, একপাশে নামিয়ে রাখা চুলে সাদা সাদা ছোপ। পড়নে একটি হলদে শাড়ি, সাথে সাদা ব্লাউজ। চোখেমুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হলেও মায়াটা কমেনি। হয়তো সে তার নাতি -নাতনিদের আমার পাগলামির গল্প শোনায়। এখন দেখলে ঠিকই আমাকে বুড়োর লাঠি বলে খোঁচা দিতো।

ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০৮০

অনেকদিন পর নানুবাড়িতে আসলাম। সাফাওয়াত কে সাথে আসতে বলায় সে বিড়বিড় করে খানিক পরে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

বাসায় ঢুকতেই জেমিন আমাকে জড়িয়ে ধরলো। সত্যি এককালে এই ছেলেকে নিয়ে কত্তো মজা করেছি। নাস্তা করে একটু ছাদে আসলাম।ছাদের এই বাগান মামার হাতে তিল তিল করে গড়া!

ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০৮০

পারিবারিক কবরস্থানে জিয়ারত শেষে ভাবলাম দাদুনকে নিয়ে একটু জিলাপি পাহাড়ে যাবো।কিন্তু বুকে ব্যথা অনুভব করার কারনে আর হলো না।

ঘুম ভাঙতেই উঠোনে দেখলাম ডেকচিতে কুল পাতা সিদ্ধ হচ্ছে। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দেখলাম অবিকল আমার মতো কেউ একজন ঘুমিয়ে আছে, সবাই থাকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে বসে বসে গল্প করছে। ফুলের সমাহার আর বয়স্কদের ভয়ার্ত চোখ দেখেই বুঝলাম লোকটি ঘুমায়নি বরং তার মৃত্যু হয়েছে

তানভীর আহমেদ আসিফ
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (বিএসসি)
চ্যাংআন বিশ্ববিদ্যালয়

Chinese Paintings of Some Gorgeously Growing Artists

Hi there! This is Tasnova Zerin Haque, an alumni of a Chinese University named Nanjing University of the Arts in Jiangsu Province, China. After my MFA (M aster of Fine Arts) graduation in 2021, I started my first career in the International School Dhaka in Bangladesh as an Assistant Art Teacher in the department of Secondary Visual Art. I tend to explore something new in my creativity and so do in my teaching. So, I utilized the grasp of mystical Chinese painting technique that I learnt during my MFA journey in China. I was quite enthusiastic to teach my students the charismatic ways of doing Chinese traditional flower and bird painting. The workshop I conducted was for grade-6 students who recently stepped into secondary school after their primary graduation. I find this class group really curious about fresh tasks in the art room. So, I thought that it was indeed the best time to make them taste a new segment of a new culture.

I prepared the Chinese painting materials, venue, theme and music to play while they will be working in the art room. Students were 12 in number, I could see the beautiful, sparkling 12 pair of eyes staring at me on the 1st day of the Chinese painting workshop. I could read the excitement and curiosity under their breath to learn something new today. It made me over the moon happy that they really appreciate my effort of teaching them something out of the box.

Firstly, I introduced a little historical background of Chinese paintingorigin and its classification through slide share. Then I taught them the way of holding Chinese painting brushes, then I described what is the importance of ink in Chinese painting and how to mix it well with color and apply them on paper. In ne xt, I asked them all to stand surrounding my

table where I will do a Chinese rooster painting. They all stood and threw their whole focus on my painting strategy. Once I completed my rooster painting, then bamboo painting and a couple of bird painting, I told them get back in their seats and start painting. Magically, every single student delightedly started to paint. My heart filled with joy when I realized that they were actually enjoying the painting sessions and were asking for more papers to draw more. Their faces lit up because of the amusement they were receiving from that fun full workshop. The second day, I taught them the way of painting gold fish in Chinese painting technique. They find the painting technique really cool and quick. Because they did not need to use any pencil to draw line drawings before applying color, all they needed to hold the brush right and mix the color with appropriate amount of ink and water.

During the whole workshop tenure, I have produced my own Chinese painting pieces which were truly informative to my students. 7 of the painting photos are given here…

At the end of the workshop, me and my lovely colleague Ms. Bridget decided to exhibit the student's paintings in Chinese scrolls on campus for the school community. It was a very successful and pleasant workshop where I shared my Chinese cultural knowledge that I accumulated during my stay and study in China.

Tasnova Zerin Haque
Alumni, Nanjing University,
Jiangsu Province, China.

আলোকচিত্র

আলোর সূচনা

পড়ন্তবিকেল

আধপেটা যিশু

হাতছানি

হাসিবুল হাসান সৌরভ
বিএসসি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
সাউথইস্ট পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটি, চেংডু, সিচুয়ান, চীন।

সমাপ্ত

মহাপ্রাচীর ম্যাগাজিন সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে
অথবা পরবর্তী সংখ্যায় লেখা পাঠাতে ইমেইল করুন :
mahaprachir@outlook.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন : mahaprachir@outlook.com

পূর্ববর্তী ম্যাগাজিনের সংখ্যাগুলো পেতে ভিজিট করুন :
https://www.bcysa.org/magazines

চীনে শিক্ষা, স্কলারশিপ, বাণিজ্য এবং চীন ও বাংলাদেশ সম্পর্কে আপডেট পেতে ভিজিট **করুন :**

ফেইসবুক পেইজ :
www.facebook.com/bcysaofficial

ফেইসবুক গ্রুপ :
www.facebook.com/group/bcysa.cn

বিস্তারিত জানতে ভিজিত করুন :
www.bcysa.org